পাতাপাহাড়ীর বনদেবতা
নীললোহিত

আজ আমরা জঙ্গলে ভূত দেখতে যাব।

রণছোড়জি দুপুর থেকে উত্তেজনার চোটে বালক হয়ে গেছে, একটা ল্যাঙ্গোট পরে লাফালাফি করছে উঠোনে। ভূত দেখা বা ভূত ধরার ব্যাপারে ভূতের চেয়ে রণছোড়জিই আজ নায়ক, অন্তত আরও সাতজন আমাদের দলে যোগ দিতে চেয়েছিল, কাকুতি-মিনতি করেছিল, কিন্তু রণছোড়জি ধমকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের। কর গুনে গুনে বলেছে, ম্যায়, চুনিলালবাবু, নীললোহিত ভাইয়া আওর বড়াসাহেব, স্রিফ এই চার আদমি। আউর কিসিকো যানে নেই দুঙ্গা।

রণছোড়জিই প্রথম ও একমাত্র আগে ভূতটাকে দেখেছে, সুতরাং ভূতটা তারই সম্পত্তি। এখন যদি অন্য কোনও দল আলাদাভাবে আলবেলি ঝাপটায় যেতে চায়, রণছোড়জি তাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করবে। সেইজন্যই সে কখনও একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, কখনও একটা রামদায় শান দিচ্ছে। আমি বাংলোর পেছন দিকের বারান্দায় বসে ওর দিকে তাকাতেই পারছি না। আজকাল সবাই জাঙ্গিয়া পরে, এই বিহারের দিকে এখনও ল্যাঙ্গোটের চল আছে, তাতে কেমন যেন অসভ্য অসভ্য দেখায়।

বাংলোটা জঙ্গলের ধারে। বেশ পুরনো, ইংরেজদের আমলে তৈরি। জায়গা পছন্দ করার ব্যাপারে ইংরেজদের নজর বেশ উঁচু ছিল, একদিকে জঙ্গল, অন্যদিকে নদী। একসময় নাকি খুব হাতির উপদ্রব ছিল, বাংলোর ওপর হাতি এসে পড়লে এখানকার রেঞ্জার সাহেব নৌকোয় চড়ে পালাতেন। অন্য সময়, জ্যোৎস্নারাতে নদীটিকে মনে হয় একটা চন্দ্রহার।

জঙ্গল থেকে হাতি অনেকদিন আসে না, তবে রাত্তিরের দিকে কিছু একটা শব্দ হলেই গা ছমছম করে, এবং সেই ভয়টা বেশ উপভোগ করা যায়। হঠাৎ হঠাৎ ময়ূরী ডেকে ওঠে কর্কশ গলায়, বাঁদরের পাল হুপ হুপ করতে করতে গাছের ডালে লাফালাফি করে। পরপর দু'রাত্তির আমি ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। অথচ, আমার পাশের খাটে, এখনকার

রেঞ্জারবাবু অর্থাৎ আমার মেঘুদা, দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোয়।

রেঞ্জারসাহেবকে সবাই মেঘুবাবু বলেই জানে, সেটা তার নাসিকা গর্জনের জন্যই নয়, খাতাপত্রেও তার নাম মেঘনাদ ঘোষাল। শুধু আমি জানি, ওঁর আসল নাম মেহগেনি ঘোষাল। আমাদের মুমুর বাবা চন্দন ঘোষালের ভাই। এঁদের বাবা বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, প্রথম ছেলের নাম চন্দন রাখার পর ঠিক করেছিলেন, পরের সব ছেলেমেয়ের নামও গাছপালা দিয়ে রাখা হবে। চন্দনদার ছোট দুই ভাইয়ের নাম মেহগেনি আর শিংশপা, আর দু'বোনের নাম দুর্গালতা আর সোনাঝুরি। বাবার মৃত্যুর পর, চন্দনদা ছাড়া আর সবাই ইচ্ছেমতন নাম বদলে নিয়েছে। শিংশপাদা-কে প্রকাশ্যে ওই নামে ডাকলে দারুণ চটে যান, এফিডেবিট করে এখন হয়েছেন অর্জুন। বাবার ইচ্ছেটাকে পুরোপুরি বাদ দেননি।

এই বাংলোর দু'দিকেই বারান্দা। কখনও নদীর দিকের বারান্দায় বসা হয়, কখনও জঙ্গলের দিকে। মেঘলা দিনে নদী ভাল লাগে, খটখটে রোদের দিনে জঙ্গলের সবুজ চোখ জুড়োয়।

বিকেলে জঙ্গলের বারান্দায় চা দিয়েছে চিখরিয়া। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা হলেও চিখরিয়া আমাদের মায়ের বয়েসী। এই চিখরিয়া আর রণছোড়জিকে নিয়েই রেঞ্জারবাবুর সংসার। মেঘুদা বিয়ে করেনি। রণছোড়ের চেয়ে চিখরিয়ারই দাপট বেশি, সে-ই সবকিছু সামলায়, রণছোড়কে বকে বকে টিট করে রাখে। মেঘুদার মা একবার এখানে এসে কিছুদিন ছিলেন, তিনি চিখরিয়ার কানে কানে কী মন্ত্র দিয়ে গেছেন কে জানে! তারপর থেকে সে নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করে, আর কোনও স্ত্রীলোককে এ বাংলোর ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেয় না। এমনকি সকালবেলা বিমলি নামে যে-মেয়েটি দুধ দিতে আসে, সে যেহেতু যুবতী, তাই গেটের ভেতরে আসার তার হুকুম নেই। কী জ্বালা! বিমলির সঙ্গে ভাব করতে চাই না, শুধু কাছাকাছি থেকে তার শরীরের গড়নটা আমার দেখতে ভাল লাগে, তাও দেখতে দেবে না! আমি ভোর ভোর জেগে বাইরে বসে থাকি, কিন্তু বিমলির সঙ্গে একটা কথা বলার আগেই চিখরিয়া এসে চিৎকার শুরু করে দেয়। যুবতী বলে বিমলিকে বকুনি খেতেই হবে!

চিখরিয়া দিনরাত একটা ডুরে শাড়ি পরে থাকে। সব সময় মনে হয়, সে যেন সারা বাড়ি একটা ঘূর্ণির মতন ঘুরছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে মেঘুদা বলল, কী রে, ন্যাপলা, তুই কি ভূত বিশ্বাস করিস নাকি?

আমি চোখ সরু করে বললুম, তুমিও লালুদার শিষ্য হয়েছ বুঝি?

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেতে হলে স্বাস্থ্য ভাল ও লম্বা হতে হয়। চন্দনদার ভাইদের মধ্যে এই মেঘু ঘোষালের চেহারার খুব সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু চাকরির আরামে একবার বশীভূত হয়ে গেলে শরীরেও তার বেশ ছাপ পড়ে। মেঘুদার এখন দিব্যি নেয়াপাতি ভুঁড়ি হয়েছে, বেল্টের গর্ত বেড়ে গেছে দুটো, মাথায় অল্প টাক পড়েছে। অবশ্য এখনও লম্বা-চওড়া চেহারার জন্য লোকে তাকে মানে।

মেঘুদা বললেন, লালুদা? সে আবার কে?

আমি বললুম, চন্দনদার বাড়িতে দেখোনি, প্রায়ই এসে বসে থাকে। তোমার বউদির প্রেমিক!

মেঘুদা হো-হো করে হেসে বলল, ওঃ, সেই যে সর্ব ঘটে কাঁঠালি কলা? পরোপকার করার জন্য সব সময় মরিয়া হয়ে আছে? তার কথা হঠাৎ বললি কেন?

আমি বললুম, তুমি আমাকে ন্যাপলা বলে ডাকলে কেন? লালুদা যখন তখন আমার নাম ভুলে গিয়ে অন্য নামে ডাকে।

মেঘুদা বলল, এই ব্যাপার! নামের একটু এদিক-ওদিক হলেই লোকে বড্ড চটে যায়।

আমি বললুম, মেঘুদা, তুমিও তার ব্যতিক্রম নও। চন্দনদাদের তো এখানে আসার জন্য নেমন্তন্ন করেছ সপরিবারে, দেখো, ওদের সঙ্গে লালুদাও ঠিক এসে জুটবে। তোমাকেও যে কত নামে ডাকবে তার ঠিক নেই। মেঘের বদলে বৃষ্টি, কাদা, ব্যাঙ যা খুশি বলতে পারে।

মেঘুদা বলল, তা হলে সে ব্যাটাকে আমি বন্দুক দিয়ে গুলি করব। যাক গে। আসুক তো, তখন দেখা যাবে। তোকে যা জিজ্ঞেস করছিলুম, তুই ভূত-ফুতে বিশ্বাস করিস?

আমি সবেগে দু'দিকে মাথা নেড়ে বললুম, মোটেই না।

—তা হলে তুই রণছোড়ের কথায় নেচে উঠেছিস যে?

—রণছোড়জি যে বলল, ও সত্যি ভূত দেখেছে?

—যে ভূত মানে না, তার কাছে যে-কোনও গল্পই সত্যি হয় কী করে? ও ব্যাটা তো কত কথাই বলে!

— তা হলে তুমিই বা যেতে রাজি হয়েছ কেন?

এই সময় পেছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চিখরিয়া বলল, ওই রণছোড়িয়া গাঁজা খায়। ভূত-পিশাচ, হুরি-পরী কত কী দেখে! ওর কথা বিশ্বাস করতে আছে?

মেঘুদা বলল, এই চিখরিয়া, সামনে আও! তুমহারা ইয়াদ হ্যয়, এই

তো গত শনিবারে চৌধারিবাবুকা ডেরামে কই ভয়ানক আত্মা আকে অচানক হামলা কিয়া। এক আদমিকা গলা পাকাড়কে, মুচড়ে মুচড়ে

চিখরিয়া ভালই বাংলা জানে, তবু তার সামনে মেঘুদার খুব ভাল হিন্দি বলা চাই। সেই হিন্দি শুনে সে হাসে।

চিখরিয়া বলল, ও কোনও আত্মা না আছে, বড়বাবু। ও বনদেবতা।

মেঘুদা বলল, এই লাও, এতক্ষণ সবাই বলছিল ভূতের উপদ্রব। এখন এ আবার কোথা থেকে বনদেবতা আমদানি করল। বনদেবতা-টেবতা আবার কী রে! আমি দিনে, রাতে কতবার এই জঙ্গল চষে বেড়িয়েছি। আমার তো কোনওদিন কিছু চোখে পড়েনি!

চিখরিয়া বলল, আমি দু'বার দেখেছি, বড়বাবু। ভাল মানুষদের কিছু বলে না। আমার দিকে একবার দেখল, চকমকির মাফিক আঁখ, অন্যদিকে চলে গেল। ভূষণ চৌধুরিবাবুটা ভারি বদমাস, দুটা শাদি করেছে!

মেঘুদা আমার দিকে চোখ টিপে বলল, দেখলি, এই ফাঁকে চিখরিয়াটা জানিয়ে দিল, ও ভাল মানুষ! বনদেবতা ওকে গ্রাহ্যই করেনি। আরে চিখরিয়া, ভূষণবাবু যে খারাপ আদমি, ও তো সব লোক জানতা হ্যয়। কিন্তু ভূতই বল আর বনদেবতাই বল, সে ভূষণবাবুকে ছেড়ে তার এক নিরীহ গরিব কর্মচারির গলা মুচড়ে মারতে গেল কেন?

শীত এসে গেলে বসন্ত কি দূরে থাকতে পারে? চিখরিয়া এসে সাহেবের কাছে চুকলি কাটছে। রণছোড়জি তা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনবে না, তা কি সম্ভব?

সে বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়ে একটা সরল উক্তি করল, সাব, যে জঙ্গলে ভূত-প্রেতযোনি থাকে, সিখানে বনদেবৃতা টিকতে পারে না। এই চিখরিয়াটা একঠো শালিকের বাচ্চার মতন মুরখ্, তাই ও জানে না যে বনদেবৃতা কোনওদিন কোনও আদমি ঔর জেনানার গায়ে হাত লাগায় না। আমি গাঁজা খেয়ে হুরি-পরী দেখি, আর ও বেটি কী খেয়ে বনদেবৃতাকো দেখনে পায়া? পুছ লিজিয়ে!

চিখরিয়া যত সম্ভব গলা সরু করে বলল, আমি যদি মূরখ হই, তুই তবে গাছের বোবা ডাল। আমি যদি শালিকের বাচ্চা হই, তুই তবে গিধ্ধড়ের না ফোটা ডিম। আমাকে গাঁজা খেতে হয় না, খালি চোখেই আমি বনদেবৃতাকে দেখতে পাই।

মেঘুদা উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দু'জনের ঝগড়া থামাল।

গম্ভীর গলায় ঘোষণা করে দিল, আজ রাত্তিরে আমি নিজেই তো যাচ্ছি, তখন ফয়সালা হবে।

তারপর সে চিখরিয়াকে আবার চা বানিয়ে আনতে বলে রনছোড়জিকে জিজ্ঞেস করল, তুই আজও গাঁজা খেয়েছিস?

রণছোড়জি লজ্জায় প্রায় কুঁকড়ে গিয়ে দুটো আঙুল জুড়ে বলল, বহুৎ কমতি, ইতনি থোড়া—

—তুই নীলুবাবুকেও গাঁজা খাইয়েছিস?

—নেহি, নেহি সাব, কালীমায়ীকা কসম, আজ আমি নীলুবাবুকে কুচ্ছু দিইনি!

—আজ দিসনি, কাল দিয়েছিলি?

রণছোড়জি একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। আমি সংকুচিতভাবে বললুম, মেঘুদা, বিশ্বাস করো, আমিও ঠিক খাইনি। কাল সন্ধেবেলা মাত্র দু'টান দিয়ে দেখছিলুম জিনিসটা কেমন? কেন লোকে খায়!

মেঘুদা বাঁকা গলায় বলল, ওর সঙ্গে গাঁজা খেয়ে খেয়ে তোরও ভূতে বিশ্বাস জন্মে গেছে!

এই সময় সাইকেলে ক্রিংক্রিং বাজিয়ে এসে হাজির হলেন চুনিলালবাবু। ধুতি ও সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, পায়ে সাদা কেড্‌স, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, রোগা অথচ মজবুত চেহারাটা দেখে মনে হয়, বয়সের গাছ-পাথর নেই, চোখের দৃষ্টি সব সময় নিঃসঙ্কোচ। এই মানুষটিকে দেখলেই আমার ভাল লাগে।

আমি বহু জায়গা ঘুরি, বহু জায়গায় বিনা উদ্দেশ্যে থেকে যাই, এক জায়গায় আকস্মিকভাবে এক একটি মানুষকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়ি। মনে হয়, এই মানুষটিকে না দেখলে জীবনটা কত অর্থহীন, অসম্পূর্ণ থেকে যেত। গয়া শহরের মতন চোর-ডাকাত ভরা জায়গায় এক অতি গরিব ভুজিয়াওয়ালা আমাকে যে অত্যাশ্চর্য জীবন দর্শনের কথা বলেছিল, তা শুনেই আমার মনে হয়েছিল, বার্ট্রান্ড রাসেলের সঙ্গে এই লোকটির পরিচয় হল না কেন?

চুনিলাল সাউ জাতে উড়িয়া। অর্থাৎ এক সময় তিনি উড়িষ্যার লোক ছিলেন, এখন তাঁকে বলা যায়, বিশ্বনাগরিক! পৃথিবীর দূরদূরান্তের মানুষ এই পাতাপাহাড়ীর মতন একটি নগণ্য জঙ্গল-ঘেঁষা জায়গার চুনিলাল সাউকে চেনে না। কিন্তু চুনিলাল সাউ পৃথিবীর অনেককে চেনে এবং সব সময় এই পৃথিবী নিয়েই মাথা ঘামায়। প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন হাসপাতালে ভর্তি হলে চুনিলাল সাউ চিন্তিত হয়ে এসে বলে, মানুষটার কী হল বলুন তো! হার্ট অ্যাটাক? শোনা যায়, তিনি বেশি মদ খান, মাঝে মাঝে নিজেকে সামলাতে পারেন না। না, না, না, এটা তো উচিত হয় না, এতগুলি মানুষের ভাগ্য যার হাতে, একটা দেশের প্রেসিডেন্ট বলে

কথা, তিনি কেন বেশি মদ খাবেন ? তা হলে প্রেসিডেন্ট হওয়া কেন ? প্রেসিডেন্টরা তো আগেকার আমলের রাজা-মহারাজদের মতন স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না, বলুন।

বেশিরভাগ মানুষই ঘর-সংসারের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বিশেষ করে, যাদের আর্থিক সচ্ছলতা থাকে না, তাদের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। চুনিলালের নিজস্ব কোনও রোজগারই নেই। আমি বারবার লক্ষ করেছি, টাকা জিনিসটা নিয়ে তিনি একেবারেই মাথা ঘামান না। ওঁর পকেটে একটা প্লাস্টিকের ছেঁড়া খাপে তিরিশ-চল্লিশ টাকা সব সময় থাকে, বিড়ি কেনা ছাড়া কোনও খরচ নেই। কোনও জায়গায় টাকা-পয়সা নিয়ে কথা উঠলেই তিনি প্ল্যাস্টিকের খাপটা সন্তর্পণে বার করে লাজুকভাবে বলেন, আমার কাছে অনেক টাকা আছে, দেব ? এখন কাজ চালিয়ে নেও না ভাই !

সবাই বোঝে, চুনিলালবাবু তিরিশ-চল্লিশ টাকাকে সত্যিই অনেক টাকা ভাবেন, এবং অন্যের যে-কোনও প্রয়োজনে বিড়ির খরচ না রেখেই পুরোটা অম্লান বদনে দিয়ে দেবেন। এমন একজন মানুষ কী করে সারা বিশ্বকে আপন মনে করেন, সেটা আমার কাছে ধাঁধার মতন লাগে।

এই ক'দিনেই জেনেছি, চুনিলাল সাউ কিছুটা লেখাপড়া জানেন, এক সময় নাকি কোনও স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, এখন তাঁর কোনও নির্দিষ্ট জীবিকা নেই। এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে তাঁর একটা ঘর আছে, সেখানে আর কেউ নেই, কাজের লোকও নেই। এই সাইকেলই তার আসল ঘরবাড়ি। শামুক যেমন নিজের বাড়ি নিজের পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, চুনিলালবাবুরও সেই অবস্থা। যখন যেখানে ইচ্ছে থেকে যান। তিনি একটি অন্য জাতের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, তাতে দু' পক্ষেরই ঘোর আপত্তি, হিংস্র আপত্তি ছিল, তখন সেই স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এই অঞ্চলে এসে আস্তানা গাড়েন। এখানে কেউ তাঁকে বা তাঁর স্ত্রীকে চিনবে না। সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটা প্রাথমিক স্কুলে তিনি কাজ পেয়েছিলেন।

ওঁদের পুরোটা ইতিহাস আমি একদিনে শুনিনি। টুকরো-টাকরা কথা থেকে গল্পটা জুড়ে নিয়েছি। উনি নিজে বিশেষ কিছু বলেন না, অন্যদের কাছ থেকে শোনা।

চুনিলাল সাউয়ের স্ত্রীর নাম ছিল ময়নামতী। রীতিমতন লেখাপড়া জানা, সুন্দরী তরুণী। বালেশ্বরের এক ধনী কাঠের কারবারির মেয়ের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন চুনিলাল। গরিবের ছেলে। তাঁর চেহারার সে রকম কোনও জৌলুস নেই, কথাবার্তায়ও নেই সেরকম চাকচিক্য, ছাত্রীকে

তিনি কোনও প্রলোভন দেখাবারও চেষ্টা করেননি। সে রকম স্বভাবই নয় তাঁর। কাঠের কারবারির মেয়ে ময়নামতী নিজের পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয়স্বজনের মুখে রসকষহীন ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই শুনে এসেছে বরাবর, কিন্তু এই লোকটির নিঃস্বার্থভাবে সারা পৃথিবীর জন্য চিন্তা দেখে সে আস্তে আস্তে মুগ্ধ হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় কোথায় রেইন ফরেস্ট আছে, তা জানেই না ময়নামতী। কিন্তু সেই জঙ্গল কাটা হচ্ছে বলে চুনিলালের চোখ ছলছল করে, কালাহাণ্ডিতে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে বলে তার এই মাস্টারমশাই ছুটি নিয়ে চলে যায়, জাপানের উপকূলে কয়েকশো তিমি মাছ আত্মহত্যা করেছে শুনে চুনিলাল একদিন পড়ানো বন্ধ রেখে সেই কথাই বলে : এই সমস্ত কথা বলার সময় তাঁর চোখে যেন সততার একটা আলো জ্বলে। ময়নামতীর সদ্য-যুবতী হৃদয় এমনই মুগ্ধ হল যে, সে নিজেই ঘোষণা করল, চুনিলালকে ছাড়া বাঁচবে না। ময়নামতীর আতিশয্যেই চুনিলালবাবু তাকে নিয়ে দেশান্তরী হন।

পাতাপাহাড়ী জঙ্গলের ধারে একটা নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। এখানকার নুড়ি-পাথর রেল লাইনের পক্ষে খুব উপযোগী। স্টোন কোয়ারি শুরু হবার পরই জীবিকা ও উপজীবিকার সন্ধানে এসে জুটছে নানা রকমের মানুষ। বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে, আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাচ্ছে অরণ্য।

এই রকম উঠতি জায়গায় ঠিক কোনও সমাজবন্ধন থাকে না। কে কোথা থেকে আসছে, কার কী জাত-পাত, তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। সুতরাং আত্মীয়দের কাছ থেকে পলাতক ময়নামতী-চুনিলালের এখানে বাসা বাঁধতে কোনও অসুবিধে হল না। চুনিলাল নিজের যোগ্যতায় এখানকার স্কুলে চাকরি পেলেন, ময়নামতী ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের গান-বাজনা শেখাতে লাগল।

বেশ ভালই দিন কাটছিল, ওঁদের একটি পুত্রসন্তানও জন্মেছিল। ছেলের নাম রোহিতাশ্ব, তার যখন ঠিক আড়াই বছর বয়েস, তখন সেই পুত্রসমেত তার মা ময়নামতী অদৃশ্য হয়ে গেল। ময়নামতীকে যদি কোনও দুষ্ট লোক হরণ করত কিংবা কোনও দুর্ঘটনায় অপঘাত হত তবুও মানে বোঝা যেত, কিন্তু বিনা ঝগড়াবিবাদে তার অকস্মাৎ চলে যাওয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যারা রসের সন্ধান করে, তারা বলেছিল, চুনিলালের সঙ্গে ময়নামতীর বয়েসের তফাত চোদ্দো বছর, সেইজন্যই সে কোনও যুবকের সঙ্গে আশনাই করে সরে পড়েছে। কিন্তু এ তল্লাটের কোনও ছোকরা সে সময় নিখোঁজ হয়নি। বাইরে থেকেও কারুকে আসতে দেখা যায়নি। মেঘুদার ধারণা, ময়নামতীর বাবার মৃত্যু-সংবাদ

কোনওক্রমে বালেশ্বর থেকে এখানে পৌঁছেছিল, তাই ময়নামতী তড়িঘড়ি ছুটে গেছে তার সম্পত্তির ভাগ নিতে। নিজের জন্য না হোক, তার ছেলের দাবিতে। অন্য জাতের স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগই সেই সম্পত্তি পাবার শর্ত। ও দেশে এ রকম হয়। বিষয়-সম্পত্তির টান প্রেম-ভালোবাসার চেয়েও অনেক অমোঘ।

সে যাই হোক, চুনিলালবাবু আর নিজের স্ত্রীর খোঁজে বালেশ্বর ফিরে যাননি। এখানেই রয়ে গেলেন। খুবই শোক পেয়েছিলেন, দিনের পর দিন না খেয়ে না দেয়ে বিছানায় পড়ে থাকতেন মুখ গুঁজে। ইস্কুলে আর যেতেন না। শেষ পর্যন্ত ইস্তফা দিলেন। এরপর তাঁর খাওয়া-দাওয়া চলবে কী করে ?

পাতাপাহাড়ীতে ঠিকাদার, পাইকার, ওয়াগন ব্রেকার, ইউনিয়নের লিডার ধরনের লোকই বেশি। তারাই অবস্থাপন্ন শ্রেণী। এরা সবসময় স্বার্থচিন্তায় মগ্ন থাকে বলেই একেবারে নিঃস্বার্থ কোনও লোককে দেখলে কিছুটা সমীহ করে। সততার একটা জোর আছেই। চোর-ডাকাতরাও প্রকৃত সৎ লোককে দেখলে দূরে সরে যায়। এখানে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, চুনিলাল সাউয়ের বাড়িতে এক রাত্রে চোর ঢুকেছিল। সে ব্যাটা করল কী, ছোরা দেখিয়ে চুনিলালবাবুকে খাটের সঙ্গে বেঁধে রেখে খোঁজাখুঁজি শুরু করল ঘরের মধ্যে। খানিক পরে সে হতবাক ! টাকা-পয়সা, সোনা-দানা কিছু তো নেই-ই, এমন কি হাঁড়িতে পরের দিনের জন্য এক মুঠো চাল পর্যন্ত নেই। অথচ ভিখিরির বাড়ি নয়, লেখাপড়া জানা মানুষের বাড়ি। ভোরবেলা সেই চোরটাই নাকি এসে এক হাঁড়ি চাল আর এক হাঁড়ি ডাল এনে রেখে গিয়েছিল দরজার কাছে।

এটা গল্প হতে পারে। চুনিলালবাবুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি চোখ কুঁচকে বলেন, সত্য যুগ এসে গেল নাকি ?

তবে, এটা ঠিক, চুনিলালবাবুর জন্য অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। আত্মাভিমানী মানুষ, এমনি এমনি কেউ কিছু সাহায্য করতে গেলে নেবেন না, তাই ঠিকাদার জয়কিষণ সিং প্রস্তাব দিয়েছিল, তার ছেলে-মেয়ে দুটিকে চুনিলালবাবু বাড়িতে এসে পড়িয়ে গেলে সে ভাল বেতন দেবে। চুনিলালবাবু তাতেও রাজি নন। মহা মুশকিলের ব্যাপার। এতে আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে ? লেখাপড়া শিখেছেন, কুলি-কামিনের কাজ তো করতে পারবেন না, একটা কিছু জীবিকা তো চাই !

চুনিলালবাবুর আসল বেদনাটা অনেকেই বোঝে না। ময়নামতী তার ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে, সেই সন্তান ছিল চুনিলালবাবুর চোখের

মণি, এখন কোনও বাচ্চা ছেলেমেয়ে দেখলেই ওঁর চোখে জল আসে। সেইজন্যই তো ইস্কুলে যেতে পারেন না।

বাচ্চাদের পড়াবেন না, বড়দের তো পড়াতে পারেন। সরকারের কাছ থেকে জয়কিষণ ঠিকাদারের নামে দুটি ইংরিজি চিঠি এসেছিল, সে চুনিলালবাবুকে দিয়ে সেই চিঠি পড়িয়ে মানে বুঝে নিল। জবাবি দরখাস্তও ওঁকে দিয়েই লেখাল। তার বদলে কিছু চাল-ডাল আর পঁচিশটা টাকা প্রণামী হিসেবে পাঠিয়ে দিল চুনিলালবাবুর ঘরে। তার দেখাদেখি অন্য ব্যবসায়ীরাও চুনিলালবাবুকে দিয়ে চিঠি পড়ায়, দরখাস্ত লেখায়। মেঘুদা বলে, আশ্চর্য ব্যাপার কী জানিস, নীলু, ওই সব লোকগুলো অন্যদের ঠকাবার জন্য সব সময় ব্যস্ত, কারুকে এক পয়সা ছাড়ার বদলে পাঁচ পয়সা বেশি নেবে, ওরা কিন্তু চুনিলালবাবুকে প্রণামী দেবার সময় উদারহস্ত !

স্ত্রী-হারাবার প্রসঙ্গ নিয়ে চুনিলালবাবু এখন আর হা-হুতাশ করেন না। সমস্ত বিশ্বের ভাবনা তাঁর মাথায়। ময়নামতীর আজও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সাইকেল থেকে নেমে চুনিলালবাবু বললেন, নমস্কার, নমস্কার। কী, আজ যাওয়া হচ্ছে তো ? সব ঠিক আছে ?

মেঘুদা বলল, আসুন, আসুন। আপনিও মশাই এই ছেলেমানুষিতে মেতে উঠলেন। ভূত বলে সত্যি কিছু আছে নাকি ?

বারান্দায় উঠে এসে চুনিলালবাবু বললেন, সেইটাই তো জানতে এসেছি। আমি নিজের চক্ষে কখনও দেখি নাই। তাই বিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না। রণছোড় কোথায় গেল ? ও রণছোড়, তুমি কি নিজের চক্ষে ভূতটাকে কখনও দেখেছ ?

রণছোড়জি বলল, হাঁ বাবুজি, যেমন আপনাকে দেখছি, সাহেবকে দেখছি, নীলুভাইয়াকে দেখছি, ঠিক সেরকম দেখেছি। একদম আঁখ বরাবর। এই শনিচরমে আমি হাট থেকে ফিরছি, জঙ্গলে জঙ্গলে পয়দলে শর্টকাট মেরে দিচ্ছি, আট-সাড়ে আট বাজে, আমার কাছে টর্চ বাত্তি আছে, কতবার এসেছি ওই সময়, আলবেলি ঝাপটার নগিজে একটা যে বহুৎ বড়া শিমুলকা পেড় হ্যায়, সেখানে দেখি যে, একটা কে দাঁড়িয়ে আছে। একদম পাত্থরের মূর্তি যৈসান ! একটুও নড়ছে না। টর্চ মেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কৌন হ্যায় রে ? হুকুমদার ! ব্যাস, আমার দিকে একবার ফিরে তাকাল, আর অমনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ! বিলকুল গায়েব ! এই দেখুন বাবুজি, বলতে বলতে আমার এখনও পাসিনা এসে যাচ্ছে।

চুনিলালবাবু মেঘুদার দিকে ফিরে বললেন, তা হলেই দেখুন, হয় রণছোড়ের চোখের অসুখ আছে, অথবা ও সত্যিই দেখেছে। ওর কথা তো অবিশ্বাস করতে পারি না।

মেঘুদা বললেন, অথবা আমরা তিনজনও ভূত ! গাঁজা খেয়ে খেয়ে ওর চোখের অসুখ শুধু না, মাথার দোষ পর্যন্ত হয়ে গেছে, বুঝলেন !

চুনিলালবাবু বললেন, আহা-হা, অমনভাবে বলবেন না। একটু-আধটু ও দ্রব্য সবাই খায় এখানে। ভূষণ চৌধারিবাবুর ক্যাম্পে কে হামলা করল বলুন ? সবাই বলছে, সেটা ভূতের কাণ্ড !

মেঘুদা বলল, সেটাও আমার বিশ্বাস হয় না। তবু, ওই জন্যই আজ বেরুচ্ছি।

ভূষণ চৌধারি উগ্র মেজাজি, দুষ্ট প্রকৃতির লোক। তার মস্ত বড় কাঠের কারবার। প্রকাশ্যে দুটো বিয়ে করেছে, এক বউ থাকে ঝাড়গ্রামে, অন্য বউ মুকুটমণিপুরে। কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। তার ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সে নাকি লোক লাগিয়ে খুন করিয়েও দিতে পারে।

প্রতি বছর জঙ্গলের খানিকটা অংশ ইজারা নিয়ে গাছ কাটায় ভূষণ চৌধারি। কুড়ি-পঁচিশজন মজুর খাটে, যতদিন পর্যন্ত গাছ কাটা চলে ততদিন তারা জঙ্গলেই তাঁবু খাটিয়ে থেকে যায়। কয়েকদিন আগে একটা তাঁবুর মধ্যে কেউ একজন ঢুকে একজন মজুরের গলা মুচড়ে মারতে গিয়েছিল। সেটা নাকি ভূতের কাণ্ড, নইলে একজন গরিব মজুরকে কে হঠাৎ অকারণে মারতে যাবে ? তার কোনও সুন্দরী, যুবতী বউও নেই।

লোকটির আর্ত চিৎকার শুনে জেগে উঠেছিল তার সঙ্গীসাথীরা। কিন্তু আততায়ীকে কেউ দেখতে পায়নি। জঙ্গলে যে-কোনও লোক ছুটে পালালেও পায়ের শব্দ হয়। লোকটি যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে চোখের নিমেষে। অথচ মজুরটির গলায় মোটাসোটা আঙুলের দাগ রয়েছে ঠিকই। তা হলে ভূত ছাড়া আর কে মারবে তাকে ? মজুররা সবাই ভোররাতেই তাঁবু ছেড়ে পালিয়েছে।

ভূষণ বাঙালি নয়। তাকে কেউ চৌধুরীবাবু বলে ডাকলে সে শুধরে দেয়, চৌধারি, চৌধারি ! যেন চৌধুরীর চেয়ে চৌধারি পদবির তেজ বেশি। সে ঘোরতর বিষয়ী মানুষ, ভূত-প্রেতে একেবারে বিশ্বাস করে না। ঠাকুর-দেবতাদের প্রতি বিশ্বাস থাকলেও ভক্তি নেই। যাকে মানুষ ঘুষ দেয় কাজ আদায় করার জন্য, তার প্রতি কি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে ? বড় বড় অন্যায় কাজ করার আগে বা পরে ভূষণ চৌধারি ধুমধাম করে স্থানীয়

বিষুন জিউ-র মন্দিরে পুজো দেয়।

তার ধারণা, লছমীপ্রসাদ নামে অপর এক কাঠের কারবারি তার সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যই তার মজুরদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। বর্ষা এসে গেলে আর গাছ কাটা যাবে না, তার অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। লছমীপ্রসাদ অবশ্য এখন এখানে নেই, কেদার-বদ্রিতে গেছে তীর্থ করার জন্য। সে যে এই সময়ে অকুস্থলে নেই, সেটাই তার দুষ্প্রবৃত্তির বড় প্রমাণ।

কোনও মজুরের ওপর হামলা হলে আসামিকে খুঁজে বার করার দায় পুলিশের। থানার দারোগা ইয়াহিয়া খান নিয়মমাফিক একবার ঘুরে গেছেন, কোনও সূত্র পাননি। ভূষণ চৌধারি এবং লছমীপ্রসাদ, এই দুজনেরই পুলিশের ওপর যথেষ্ট আধিপত্য আছে, দারোগা কাকে চটাবেন ? সুতরাং দারোগাও ভূতের ওপরেই বরাত দিয়েছেন।

জঙ্গলের মধ্যে কিছু গোলমাল হলে, তা সামলাবার জন্য রেঞ্জার সাহেবেরও দায়িত্ব থাকে। গাছ কাটার হিসেব-নিকেশও তাঁকেই রাখতে হয়। সেইজন্যই, ভূতের চোদ্দোপুরুষেও বিশ্বাস না থাকলেও মেঘুদাকে নামকাওয়াস্তে একবার সরেজমিন তদন্তে যেতেই হচ্ছে। তার নিজের কোয়ার্টারের কর্মচারী রণছোড় ক'দিন ধরে ভূত ভূত করে প্রায় পাগল করে তুলেছে তাকে।

মেঘুদা বলল, চুনিলালবাবু, ধরুন ভূতের সত্যি সত্যি দেখা পেলেন। তারপর কী করবেন ?

চুনিলালবাবু ছেলেমানুষের মতন বললেন, তাই তো, সে কথা তো ভাবিনি।

মেঘুদা বলল, ভূত তো এখানে আসামি। তাকে গ্রেফতার করতে হবে। আপনি মশাই ভূত ধরার মন্তর-টন্তর কিছু জানেন ?

চুনিলালবাবু হেসে ফেলে বললেন, আমার ঠাকুরদা কিছু কিছু জানতেন শুনেছি। তাঁর কাছ থেকে শিখে রাখা হয়নি।

মেঘুদা আমার দিকে ফিরে বললেন, কী রে, নীলে, খুব তো লাফাচ্ছিস। ভূত দেখলে তুই কী করবি ?

আমি বললুম, থরথর করে কাঁপব আর রামনাম জপ করব।

মেঘুদা বলল, অজ্ঞান হয়ে গেলে ফেলে রেখে আসব কিন্তু। যত্ত সব ! রণছোড়টা তো প্রথমেই চোঁ-চা দৌড় দেবে আমি জানি !

যার গোঁফ নেই, বিহারিরা তাকে ঠিক পুরুষ মানুষ বলেই মনে করে না। মেঘুদা তাই এখানে পোস্টিং হবার পর গোঁফ রেখেছে। সেই কাবুলি বেড়ালের ল্যাজের মতন গোঁফ চুমরে আবার বলল, আমি সঙ্গে

বন্দুক নিয়ে যাচ্ছি। ভূত হোক আর যেই হোক, দেখা মাত্তর গুলি চালাব!

॥ দুই ॥

জিপ গাড়িটা চালাচ্ছে মেঘুদা, তার পাশে আমি। আমার কোলের ওপর রাইফেল। পেছনের সিটে চুনিলালবাবু আর রণছোড়জি। সে বুকের ওপর ব্যান্ডেজের মতন বেঁধে নিয়েছে একখানা তুলসীদাসি রামায়ণ।

জ্যোৎস্নারাত। আকাশ সামান্য মেঘলা হলেও মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার চাঁদ। চাঁদ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

জঙ্গলের এক-একটা অংশের নাম কে দেয় কে জানে! আড়াই-তিন মাইল দূরে একটা ছোট্ট জলাশয় আছে। সেটার নাম আলবেলি ঝাপটা। এখন এখানে যে-সব মানুষজন দেখি, এ রকম একটা কবিত্বময় নাম তাদের কারুর মাথায় আসবে বলে মনে হয় না। আগেকার আমলের লোকদের কবিত্ববোধ বেশি ছিল? আর একটা জায়গার নাম কাউয়াখেল। মানে কী? কাকেদের খেলা? কাক নামক পক্ষিটিকে কেউ সুনজরে দেখে না। তাদের খেলা কেউ কোনওদিন মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে, এমনও শুনিনি।

আমাদের গন্তব্য আলবেলি ঝাপটায়, কিন্তু তার আগে একবার ভূষণ চৌধারির মজুরদের ক্যাম্প ঘুরে যেতে হবে। সে পর্যন্ত ভালই রাস্তা আছে। বড় বড় ট্রাক এসে কাঠ নিয়ে যায়। জঙ্গলের মধ্যে এরকম রাস্তা আমার ভাল লাগে না।

সংরক্ষিত অরণ্যে গাছ কাটা নিষিদ্ধ। কিন্তু সরকার থেকে প্রতি বছর এক একটা অঞ্চলের গাছ কাটার ইজারা দেওয়া হয়, সেখানকার বড় বড় গাছে চিহ্ন দেওয়া থাকে। সরকারেরও তো কিছু উপার্জন দরকার, আর সারা দেশে কাঠেরও প্রয়োজন আছে। ইজারাদার গাছ কেটে নিয়ে যাবার পর সেখানে আবার নতুন করে গাছ লাগাতে হয়, যাতে ভারসাম্য ঠিক থাকে। এ সবই কাগজে-কলমের নিয়ম। সব জঙ্গল তবু ক্রমশই পাতলা হয়ে যাচ্ছে। শুনেছি, ইজারাদারদের যতগুলি গাছ কাটার কথা, চুপেচাপে তার চেয়ে অনেক বেশি গাছ কেটে নিয়ে যায়, তাতেই তাদের লাভের অঙ্ক ফুলে-ফেঁপে ওঠে। সেই লাভের কিছু কিছু বখরা দেয় পুলিশ ও বন-কর্মচারিদের। মেঘুদাও ঘুষ খায় কি না কে জানে? আমার চেনাশুনো বলেই যে সৎ হবে, সিনেমার নায়কের মতন আদর্শবাদী হবে,

তার তো কোনও মানে নেই। তবে মেঘুদার মিলিটারি মেজাজ, যত বড় ধনী ব্যবসায়ীই হোক, কারুর সামনে বিগলিতভাবে হেঁ হেঁ করে হাসতে দেখিনি এ পর্যন্ত। কিন্তু একটা ব্যাপার এ ক'দিনে লক্ষ করেছি, ভূষণ চৌধারি সম্পর্কে তার কিছু একটা দুর্বলতা আছে। অন্য কেউ ভূষণের নিন্দে করলেও মেঘুদা তখন চুপ করে থেকে অন্যমনস্কতার ভান করে।

দুটো খরগোশ লাফাতে লাফাতে রাস্তা পার হয়ে গেল। সন্ধের পর সমস্ত জঙ্গলের রূপ একেবারে পাল্টে যায়। অন্ধকারে সমস্ত জন্তু-জানোয়ারেরই চোখ জ্বলে। এমনকি একবার মানসের জঙ্গলে গোরুর মতন নিরীহ প্রাণীর জ্বলন্ত চোখ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। খরগোশের চোখ দেখে বাঘ ভেবে কেউ কেউ গুলি চালিয়েছে, এমন ঘটনাও শোনা গেছে।

রাত্তিরবেলা গাছেরাও বদলে যায়। দিনেরবেলা রোদ্দুরের সঙ্গে গাছেদের জীবন ধারণের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, তাই নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে। রাত্তিরবেলা গাছেরা খেলা করে। ঘুমোবার আগে কিছুক্ষণ আমোদ-প্রমোদ।

এই রকম সময়ে কথা বলতেও ভাল লাগে না। মানুষ কথা বললে অরণ্যের বাতাস বিরক্ত হয়।

কিন্তু চুনিলালবাবু একটা ব্যাপারে খুব চিন্তিত। ওই যে মেঘুদা বলেছে, ভূত হোক বা যে-ই হোক দেখামাত্র গুলি করবে, সেটা চুনিলালবাবু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। তিনি নিরামিষাশী, সব রকম প্রাণী হত্যার বিরোধী। এমন কি ভূতকেও গুলি করা সম্পর্কে তাঁর আপত্তি আছে। সেই কথাটা তিনি মাঝে মাঝে মেঘুদাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

অবশ্য ভূতকে তিনি কোন হিসেবে প্রাণী বলে গণ্য করলেন, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

রাইফেলটা আমার কাছে। রথের মেলায় এয়ারগান দিয়ে মাঝে মাঝে বেলুন ফাটিয়েছি। একবার পর পর পাঁচটি বেলুন ফাটিয়ে এক প্যাকেট লিলি বিস্কুট প্রাইজ পেয়েছিলুম। কিন্তু সত্যিকারের জ্যান্ত বন্দুক-পিস্তল আমি আগে কখনও ছুঁয়ে দেখিনি। মেঘুদা আমার হাতেই রাইফেলটা রাখতে দিয়েছে বলে আমার একটু গর্ব গর্ব ভাব হচ্ছে বটে।

চুনিলালবাবু আমার কাঁধ ছুঁয়ে একবার বললেন, নীলু ভাইটি, হরিণ-টরিন দেখে হঠাৎ যেন গুলি ছুঁড়ে বসো না। সবই তো ভগবানের জীব, এমন কি পোকা-মাকড়েরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

রণছোড়জি গম্ভীরভাবে বলল, শিকার করনা মানা হ্যায়।

মেঘুদা বলল, আরে মশাই, জন্তু-জানোয়ার, পোকা-মাকড়ের কথা ছাড়ুন তো ! মানুষও তো ভগবানের জীব। মানুষই যে মানুষকে মারছে, তাতে আপনার ভগবান কী করছে ?

চুনিলালবাবু আফসোসের সুরে বললেন, মানুষ নিজের কর্মফলের দোষে মারামারি করে মরে, তবু আমরা ভগবানের নামে দোষ দিই।

মেঘুদা বললেন, মারামারি কোথায় ! যুদ্ধের সময় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মরে। এই মুহূর্তে বসনিয়ায় হাজার হাজার মুসলমান সার্বিয়ানদের আক্রমণের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। কালকে রেডিওতে শুনেছিলাম, কত যুবতীকে ধর্ষণ করা হয়েছে, কত শিশুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তারা তো সাধারণ সব গৃহস্থ, কর্মফল নিয়েও কোনওদিন মাথা ঘামায়নি, তারা কী দোষ করেছে বলুন তো ! তাদের আল্লাই বা তাদের রক্ষা করছেন না কেন ?

মেঘুদার এই প্রসঙ্গ তোলা উচিত হয়নি। চুনিলালবাবু আর কোনও যুক্তি না দেখিয়ে ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। এক্ষুনি কেঁদে ফেলবেন বোধ হয়। বসনিয়ায় শিশুসমেত তরুণী মায়েদের সৈন্যরা টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শুনে তিনি দু'দিন আগেই আমাদের সামনে অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

অন্যদিকে মনোযোগ ফেরাবার জন্যই আমি কৃত্রিম উত্তেজনার সঙ্গে বললাম, ওই যে, ওই যে একটা কী গেল দেখলে ? খরগোশ না হরিণ ?

মেঘুদা অট্টহাস্য করে উঠল।

তারপর বলল, এই শহুরে ছেলেগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না। যেন বাপের জন্মে খরগোশ দেখেনি ! আরে নিউ মার্কেটে যা না, কত খরগোশ দেখতে পাবি। জঙ্গলে এসে এরা একটা ছুঁচো দেখলেও আনন্দে নেচে ওঠে। বুঝলেন চুনিলালবাবু, গত মাসে আমার শালা আর ভগ্নীপোত এসেছিল বেড়াতে, বউদের সঙ্গে নিয়ে। আত্মীয়-কুটুমরা এলেই তো আমাকে একবার রাত্তিরে জঙ্গল দেখাতে নিয়ে যেতে হয়। কেউ কিন্তু জঙ্গল দেখে না। সবাই চায় জন্তু-জানোয়ার দেখতে। সেদিন এমনই কপাল, হরিণ দূরে থাক, একটা বাঁদর পর্যন্ত সামনে এল না। সবাই খুব হতাশ। বলে কী, এবার কিছুই দেখা হল না। বুঝুন, এত বড় জঙ্গল, তিন ঘণ্টা ধরে ঘুরলাম, তবু কিছুই দেখা হল না ? আমি বললাম, কলকাতায় ফিরে চিড়িয়াখানায় গিয়ে পেট ভরে বাঘ-ভাল্লুক-হরিণ দেখগে না। এতদূরে জঙ্গলে আসার কী দরকার !

চুনিলালবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আহা, আপনাদের বিভূতিবাবু লিখেছেন না, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে ! খাঁচায়

বদ্ধ জীব আর জঙ্গলের স্বাধীন প্রাণী দেখার মধ্যে একটা তফাত থাকবে না ?

চুনিলালবাবু যে কোটেশানটা দিলেন, সেটা বিভূতিভূষণের নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদার। কিন্তু এই সময়ে এই সামান্য ভুল সংশোধনের কোনও মানে হয় না।

মেঘুদা জিপে ব্রেক কষে বললেন, এবার নামতে হবে।

জ্যোৎস্নারাত হলেও আমরা বড় বড় তিন ব্যাটারির টর্চ নিয়ে এসেছি। এখানে জঙ্গল কিছুটা ফাঁকা, পাশাপাশি তিনটে তাঁবু খাটানো রয়েছে, বাইরেও কয়েকটা খাটিয়া পাতা। অস্থায়ী উনুনের মধ্যে পোড়া কাঠ, এখানে সেখানে এঁটো শালপাতা আর বিড়ির টুকরো ছড়ানো। যেন সৈন্যদের পরিত্যক্ত ছাউনি। জায়গাটা খাঁ খাঁ করছে। একেবারে নিঃশব্দ হলেও শুকনো পাতার সামান্য খরখর শব্দে চমকে উঠতে হয়।

রণছোড়জি জিপ থেকে নামেনি।

মেঘুদা চাপা গলায় ধমক দিয়ে বলল, আরে রণছোড়, তু যে বললি হামলোগকে ভূত দেখাইবি, তুই নিজেই ডরপুকের মতন গাড়িতে বসে রইলি ?

রণছোড়জি গাড়ি থেকে এক পা নেমে তৃতীয় তাঁবুটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওইখানে কামিনটাকে ধরেছিল।

মেঘুদা বলল, আমাকে রাইফেলটা দে নীলু, তুই টর্চ ধর।

আমরা সন্তর্পণে সেই তাঁবুটার দিকে এগোলুম। একেবারে কাছে এসে চুনিলালবাবু জোরে গলা খাঁকারি দিলেন।

মেঘুদা আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, আগে থেকেই ভয় পাচ্ছিস কেন ? ভূতটা কি এখনও ওখানে গুঁড়ি মেরে বসে থাকবে নাকি ?

চুনিলালবাবু বললেন, হয়তো আগে এখানে কোনও কবরস্থান ছিল। তার ওপরে তাঁবু গেড়েছে।

মেঘুদা বললেন, এই যে আপনি বললেন, ভূত বিশ্বাস করেন না ? কবরস্থান হলেই ভূত থাকবে ?

মেঘুদাই সদর্পে ঢুকে গেল আগে।

যদি আগুনের ভাটার মতন চোখ নিয়ে একটা হুতুম প্যাঁচাও সেখানে বসে থাকত, তা হলেও ভূতের গল্প খানিকটা জমত। কিন্তু কিছুই নেই। একটা ইঁদুর পর্যন্ত না।

সব কটা তাঁবুতেই ভাল করে তদন্ত সেরে, বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে মেঘুদা বলল, এখানে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বৃষ্টি

নামে। বর্ষা শুরু হয়ে গেলে আমরাও গাছ কাটতে দিই না। আর দিন দশেকের মধ্যে গাছ কাটা শেষ করতে না পারলে ভূষণ চৌধারির খুব ক্ষতি হয়ে যাবে!

চুনিলালবাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, একটা গন্ধ পাচ্ছেন? রাত্তিরবেলা জঙ্গলের গন্ধই আলাদা!

মেঘুদা বলল, আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই! জঙ্গলের সুন্দর গন্ধ পাবার জন্য আপনি বিড়ি টানতে শুরু করলেন? বিড়ির গন্ধেই যে সব মাত হয়ে যাচ্ছে!

চুনিলালবাবু ধমক খাওয়া ছেলের মতন সঙ্গে সঙ্গে বিড়িটা ফেলে দিলেন।

আমি বললুম, সামনের ওই বড় গাছটায় দেখো, দুটো চোখ জলজল করছে না? মনে হচ্ছে কেউ আমাদের দেখছে!

চুনিলালবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তাই তো!

মেঘুদা বলল, কে আর দেখবে, ওগুলো তো জোনাকি। জোনাকি চিনিস না?

একটু অপেক্ষা করে বোঝা গেল, সেখানে সত্যিই এক ঝাঁক জোনাকি।

মেঘুদা বলল, এখানে ভূত পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু প্রত্যেকটা গাছ আমাদের দেখছে, তা জানেন তো? আমরা ভাবি, গাছ বুঝি দেখতে পায় না। তা কিন্তু সত্যি নয়। গাছেদের চোখ নেই, তবু দেখে, পেট নেই, তবু খায়, মাথা নেই, তবু চিন্তা করে।

চুনিলালবাবু মেঘুদার কথায় অবিশ্বাস করে তার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাতে পারেন না। তাই হতভম্বের মতন বললেন, বলেন কী মেঘুবাবু, মাথা নেই, তবু চিন্তা করে? সে কী করে হয়?

মেঘুদা বলল, অনেক মানুষের ঘাড়ের ওপর একটা মাথা থাকে বটে, কিন্তু কিছুই চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে না। সামান্য একটা লতাও কিন্তু আমাদের মনের কথা বুঝতে পারে। আপনি খচমচ করে একটা গাছের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ুন, তারপর থেকে দূর থেকে আপনাকে দেখলেই গাছটা ভয়ে শিউরে উঠবে! আর আপনি গাছকে ভালবাসুন, আদর করুন, তারপর আপনার মনে কখনও দুঃখ হলে, গাছও দুঃখিত হবে।

চুনিলালবাবু একবার আমার দিকে তাকালেন। আমি কোনও প্রতিবাদ করছি না দেখে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, আপনি যে এক আজব কাহিনী শোনালেন!

মেঘুদা বলল, কাহিনী মানে? এসব বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। চলুন, চলুন, জিপে উঠুন। এখানে কিছু নেই তো বোঝাই গেল, এবার একবার আলবেলি ঝাপটায় ঘুরে আসা যাক।

রণছোড়জি আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, পেড়কা পেট নেহি, লেকিন পানি পিতা হ্যায়। আঁখ নেহি, তব ভি দেখনে শেকতা হ্যায়?

জিপটা আবার চলতে শুরু করায় চুনিলালবাবু খুবই চিন্তিতভাবে বললেন, গাছেরও প্রাণ আছে জানি। কিন্তু এতটা সূক্ষ্ম প্রাণী, তা তো জানা ছিল না। মেঘুবাবু, আপনি কোথা থেকে এসব শুনলেন?

মেঘুদা বলল, শুনব কেন, বই পড়েছি। আপনি চান তো সেসব বই আপনাকে পড়তে দেব।

পেছন থেকে ঝুঁকে এসে চুনিলালবাবু বললেন, ব্যাপারটা তো তা হলে খুব গুরুতর হয়ে গেল মশাই। গাছ যদি এমন সূক্ষ্ম প্রাণী হয়, তা হলে তো তাকে মারা একেবারে উচিত হয় না। আপনি ফরেস্ট রেঞ্জার হয়ে কেন গাছ কাটা অ্যালাউ করেন?

মেঘুদা বলল, আমি সরকারি চাকরি করি, সরকারি নিয়ম-নীতি বদলাবার অধিকার আমার নেই। বে-আইনি গাছ-কাটা আটকানো আমার ডিউটি। সরকার গাছ কাটার ইজারা দিলে আমি কী করতে পারি?

রণছোড়জি বলল, সাহেব, কাঠ না লিলে চুলা কী করে ধরাব? খানা কী করে পাকাব?

মেঘুদা বলল, এ ব্যাটার খালি খাওয়ার চিন্তা। এর মধ্যেই খিদে পেয়েছে নাকি রে? খানার ডিব্বাগুলো সব এনেছিস তো?

আমরা সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরিয়েছি, অত তাড়াতাড়ি রাত্তিরের খাবার খাওয়া যায় না। তাই রুটি, আলু-পেঁয়াজের তরকারি আর শুকনো মুরগির মাংস আনা হয়েছে সঙ্গে। আলবেলি ঝাপটার ধারে বসে ভূত দেখা না যাক, নৈশ পিকনিক তো হবে! সেইটাই প্রধান আকর্ষণ।

এদিকটায় গাড়ি চলার মতন রাস্তা নেই। জিপটাকে এঁকেবেঁকে পথ খুঁজে নিতে হচ্ছে। একেবারে জলার ধার পর্যন্ত যাওয়া যাবে না, খানিকটা হাঁটতে হবে। সবে মাত্র ঘড়ির কাঁটা ন'টা পার হয়েছে, তবু মনে হয় যেন কত রাত! নিস্তব্ধতারও একটা ঝিমঝিম শব্দ আছে।

এ জঙ্গলে বাঘ নেই। সরকারি হিসেব মতন দুটো বাঘের থাকার কথা, কিন্তু বহুদিন কেউ তাদের দেখেনি। হয়তো তারা অন্য জঙ্গলে চলে গেছে। পাকাপাকি হাতিও নেই, কিন্তু আসে। মাঝে মাঝে। হাতিরা গদাই লস্করি চালে কখন কোথায় যাবে তার ঠিক তো নেই। বছরে একবার-দু'বার হাতির উপদ্রব হয়। জঙ্গলের ধারে ধারে যে-সব ফসলের খেত আছে সেখানে হাতির পাল নেমে তাণ্ডব শুরু করে।

হরিণ, নীলগাই আছে কিছু। দিন দুয়েক আগে দিনের বেলা জঙ্গলে এসে আমি কালো রঙের মাঝারি আকারের একটা প্রাণীকে স্যাঁৎ করে চলে যেতে দেখেছিলুম। রণছোড়জির মতে, সেটার নাম ল্যাকারমুসা, বাংলা নাম সে জানে না। ল্যাকারমুসা কী জিনিস আমি জানি না, আগে কখনও নামও শুনিনি, বনবিড়াল জাতীয় কিছু হবে বোধ হয়।

এখন কোনও কিছুই দেখা গেল না। মেঘুদা ঠিকই বলেছে, জঙ্গলে বেড়াতে এসে অনেকেই জঙ্গল দেখে না, তুচ্ছ দু'-একটা জন্তু-জানোয়ার দেখার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু আজ আমরা চারজন যে সর্বক্ষণ বড় বড় চোখ মেলে বাইরে তাকিয়ে আছি, সেটা কোনও জানোয়ারের জন্য নয়, সারা জীবনে যা আমরা কখনও দেখিনি, অথচ শত শত গল্প শুনে এসেছি, তা দেখার জন্য।

মেঘুদা হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল, নীলু, তুই আর্নেস্ট হেমিংওয়ের লেখা 'দ্য শর্ট অ্যান্ড হ্যাপি লাইফ অফ ফ্রান্সিস ম্যাকমবার' গল্পটা পড়েছিস ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে দু' দিকে মাথা নেড়ে বললুম, না তো ! নামও শুনিনি।

মেঘুদা আমাকে পড়ুয়া ঠাওরাল কী করে ? আমি বিশ্ব-ভবঘুরে, বই টই পড়ার সময় কোথায় ? তার ওপরে আবার ইংরিজি বই !

মেঘুদা আবার জিজ্ঞেস করল, 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দা সি' পড়েছিস ?

—না।

—'স্নোজ অফ কিলিম্যানজারো' সিনেমাটা দেখেছিলি ? দেখবিই বা কী করে, তোরা তখনও জন্মাসনি ! এডগার অ্যালোন পো-র লেখাও পড়িসনি নিশ্চয়ই। 'লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ,' সেটা অন্তত পড়েছিস ? নাকি সেটাও পড়িসনি ?

—জিম করবেটের লেখা তো ? ওটা পড়িনি, কিন্তু 'কুমায়ুনের মানুষখেকো' পড়েছি ছোটবেলায়, বাংলা অনুবাদ আছে।

—আহা কী খাসা বই ! সাহিত্য থেকে দুটো জিনিস উঠে গেল চিরকালের মতন। শিকার কাহিনী আর ভূতের গল্প ! পৃথিবীর সব দেশেই এখন শিকার নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। আর বাচ্চা ছেলেরাও এ যুগে ভূত বিশ্বাস করে না। দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' পড়ে আমরা ছেলেবেলায় কত আনন্দ পেয়েছি। আমার দিদির ছেলের জন্মদিনে একখানা ওই বই উপহার দিলাম, সে পাতা উল্টেও দেখল না। সে শুধু কমিক্স পড়ে।

—মেঘুদা, এখন শিকার কাহিনী আর ভূতের গল্প এই দুটো মিলিয়ে

একটা নতুন জিনিস তৈরি হয়েছে। তার নাম সায়েন্স ফিকশন। বাংলায় বলে, কল্পকাহিনী।

—আরে দুর দুর। ইঁদুরের মতন মুখওয়ালা অন্য গ্রহের প্রাণী মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, ওসব দেখলেই আমার ঘেন্না করে। মহাকাশ সম্পর্কে এখনও আমাদের জ্ঞান কিস্যু হয়নি। যতসব গাঁজাখুরি ব্যাপার। আগেকার দিনের শিকার কাহিনী পড়ে যে রকম উত্তেজনা ভোগ করা যেত—

চুনিলালবাবু বললেন, শিকার বন্ধ হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে। মেঘুবাবু, আজ যদি আমরা সত্যি ভূত দেখতে পাই, তা হলে কিন্তু সেই কাহিনীটা ভাল করে লিখতে হবে।

মেঘুদা জিজ্ঞেস করল, কে লিখবে ?

চুনিলালবাবু বললেন, আপনি লিখবেন ! আপনি এত বই পড়েন, আপনি ভাল লিখতে পারবেন।

মেঘুদা বলল, বই পড়লেই ভাল লেখা যায় ! তা হলে তো শুধু পণ্ডিতরা সাহিত্যিক হত ! আমি একা একা থাকি, তাই বই পড়ি। একটা চিঠি লিখতে গেলে কলম ভেঙে যায়। আপনিই বরং লিখবেন, বাংলায় না পারেন, ওড়িয়া ভাষাতেই লিখবেন, আমরা ঠিক বুঝে নেব।

সামনে আর পথ নেই, এবার হাঁটার পালা। গল্পে গল্পে, মেঘুদা, চুনিলালবাবু আর আমি কিছুক্ষণের জন্য ভূতের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। রণছোড়জি এসব কথায় আর অংশগ্রহণ করেনি। আলবেলি ঝাপটায় ভূত দেখাবার দায়িত্ব তার একার।

জিপ থেকে নেমে, সব জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে আমরা এক লাইন করে এগোলাম। বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে এসে চারজন মানুষ ভূত দেখতে যাচ্ছে। এটা একটা হাসির ব্যাপার। অ্যাডভেঞ্চারটাই আসল। মেঘুদা সন্ধের পর জিপ চালাতে চায় না, রণছোড়জি ভূতের হাঙ্গামা নিয়ে সোরগোল না তুললে এখানে এই সময়ে আসাই হত না।

আলবেলি ঝাপটা একটা স্বাভাবিক জলাশয়। এক সময়, যখন মানুষের সংখ্যা কম ছিল, তখন জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যা ছিল বেশি, তারা এখানে জলপান করতে আসত। এখন বন্যপ্রাণী খুবই কমে গেছে। এখানে সারা রাত ঘাপটি মেরে বসে থেকেও কেউ কেউ একটা হরিণ পর্যন্ত দেখতে পায়নি, এ কথা মেঘুদার কাছে অনেকবার শুনেছি।

আমাদের সঙ্গে লটবহর কম নয়। কয়েকটি খাবারের ডিব্বা, ফ্লাস্ক, জলের গেলাস, এমন কি একটা সতরঞ্জি পর্যন্ত আনা হয়েছে। সব কিছু বয়ে নিয়ে এসে একটা চওড়া পাথরের ওপর বসা হল জুত করে।

জ্যোৎস্নায় চকচক করছে আলবেলি ঝাপটার জল, আশেপাশের অনেকখানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

খাবারদাবারগুলো বের করা হল আগে। এ ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে ফেলাই ভাল। মেঘুদা ফ্লাস্ক থেকে একটা গেলাসে হুইস্কি ঢেলে বলল, চুনিলালবাবু, আপনি তো এসব ছোঁন না, সাত্ত্বিক লোক। আমি মশাই রজোগুণের মানুষ, আমার রোজ একটু আধটু না হলে চলে না। সন্ধের পর প্রায়ই তো একা থাকি, সঙ্গে একটা গেলাস আর বই, দিব্যি সময় কেটে যায়।

চুনিলালবাবু বললেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন রকম গুণের মানুষ তো থাকবেই। রজোগুণীরা অনেক মানুষকে একসঙ্গে চালাবার ক্ষমতা ধরে।

আমি ফুট কেটে বললুম, ভূষণ চৌধারিও রজোগুণী। সেও মদ খায়!

চুনিলালবাবু দারুণ আপত্তি করে বসলেন, না, না, না। ভূষণ লোক ঠকায়, মানুষ মারে, সে তমোগুণী! দেবরাজ ইন্দ্রও তো মদ্যপান করেন, সেটা দোষের কিছু নয়।

মেঘুদা জোরে হেসে উঠে বলল, আপনি বললেন ইন্দ্রের কথা, আর আমি মেঘনাদ!

তারপরই জিভ কেটে বলে উঠল, জোরে হাসলে চলবে না। আমাদের কথাবার্তা শুনলে ভূত পালাবে। একেবারে নিঃসাড়ে বসে থাকতে হবে, তাই না? কী জ্বালা! এই সময় বাংলোয় বসে দিব্যি গুলতানি করা যেত, তা না, এখানে বসে বসে মশার কামড় খেতে হবে। আমি কিন্তু ঠিক দু' ঘণ্টা থাকব এখানে, তার মধ্যে ভূত আসুক বা না আসুক, বাংলোয় ফিরে গিয়ে ঘুমোব।

কিছুক্ষণ চুপ চুপ কাটল। মেঘুদা, চুনিলালবাবু আর আমি চেয়ে আছি সামনের দিকে। জলাশয় পেরিয়ে জঙ্গলে। রণছোড়জি পিঠ ফিরিয়ে বসেছে, তার বুকে রামায়ণ বাঁধা আছে, তবু তার ধারণা, ভূত যদি পেছন দিক থেকে হঠাৎ এসে পড়ে!

এরকম মেঘশূন্য আকাশ আমি আগে কবে দেখেছি মনে পড়ে না। যদিও বর্ষার আর দেরি নেই, তবু আজকের আকাশ তকতকে নীল। ছোট বড় অসংখ্য নক্ষত্র। অনেকক্ষণ বিশেষ একটি তারার দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, সেই তারাটাও আমাকে দেখছে। অথচ, এমনও হতে পারে, ওই তারাটা বেঁচে নেই। ওর আলো পৌঁছতে বহু কোটি বছর লাগে। ওর মৃত্যুর আগেকার আলো আমি এখনও দেখতে

সত্যি শিমুল গাছটা তো দেখা যাচ্ছে না। তবে কি আমাদের দিক ভুল হল? পেছন ফিরে মেঘুদাদের ঠিকই দেখা যাচ্ছে। রণছোড়জি এই জঙ্গলে কাজ করছে বহু বছর, তার দিক ভুল হবার কথা নয়। আমিও দু'-তিনবার গাছটাকে দেখেছি এখানে। অতবড় গাছটা কি হাওয়ায় উড়ে গেল?

হতভম্বের মতন দু'জন তাকালুম দু'জনের দিকে।

রণছোড়ের চোখ প্রায় কপালে ওঠার উপক্রম। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমি বললুম, চলুন তো অন্যদিকগুলো ঘুরে দেখি। আমরা বোধ হয় উল্টোদিক থেকে এসেছি!

টর্চ জ্বেলে আমরা আলবেলিটার চারদিকে ঘুরলুম। আর কোথাও ওরকম শিমুল গাছ নেই। মাথাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। অত বড় শিমুল গাছটা অদৃশ্য হয়ে যাবে কী করে? আগের জায়গায় ফিরে এসে টর্চ জ্বেলে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলুম। গাছটা কেউ কেটে নিলে গুঁড়ির কিছুটা থাকবে, কাঠের চাকলা টাকলা পড়ে থাকবে, সেসব কিছু নেই। যেন এখানে কখনও ওরকম একটা গাছ ছিলই না। এ হতেই পারে না, আমাদের দু'জনেরই ভুল হচ্ছে? গাছটা কোথায়?

এইবার একটা খচর মচর আওয়াজ পাওয়া গেল। জঙ্গল দিয়ে কেউ হেঁটে আসছে। সেদিকে তাকাতেই মানুষের মতন একটা আকৃতি চোখে পড়ল, সে আসছে এ দিকেই। রণছোড়জি আমাকে কিছু না বলেই চোঁ চাঁ দৌড়। ওর ওই ভয় পাওয়া দেখেই আমার ভয় ধরে গেল। সত্যি কথা বলতে কী, বুকের মধ্যে এমন কাঁপুনি এর আগে কখনও বোধ করিনি।

আমিও হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে দৌড়ে মেঘুদার কাছে গিয়ে ঝপাস করে বসে পড়ে বললুম, কে যেন আসছে!

মেঘুদা রাইফেল তুলে ধমক দিয়ে বলল, আমার সামনে থেকে সরে যা।

একজন কেউ আসছে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। আস্তে আস্তে পা ফেলে। অন্য কারুর উপস্থিতি নিয়ে যেন তার চিন্তা নেই। মানুষেরই মতন চেহারা, বেশ লম্বা, খালি গা, পরনে একটা নেংটি, মুখে অল্প অল্প দাড়ি, মাথার চুল কাঁচাপাকা। হাতে তার লাঠি-সোঁটাও কিছু নেই।

যেখানে শিমুল গাছটা থাকার কথা ছিল, সেখানে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তারপর বেশ জোরে জোরে কুঁক কুঁক করে শব্দ করতে লাগল। সেই শব্দে যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

মেঘুদা কিছুটা মাতাল ও পুরো অফিসারসুলভ গলায় গর্জন করে

উঠল, কে ? কে ওখানে ?

কোনও উত্তর নেই। সেই মানুষের মতন প্রাণীটি আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না।

মেঘুদা আবার বলল, কে ওখানে ? আমি রেঞ্জার মেঘনাদ ঘোষাল বলছি, মাথার ওপরে হাত তুলে এগিয়ে এসো, না হলে গুলি করব !

চুনিলালবাবু সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাতর গলায় বললেন, না, না, গুলি করবেন না। বোধ হয় মানুষ।

মেঘুদা এক ঝটকায় তাঁকে ঠেলে দিয়ে বলল, সরুন তো মশাই। মানুষ ছাড়া আর কী ? আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, আমার সামনে যদি একটা কঙ্কাল হাত-পা ছুঁড়ে নাচানাচি শুরু করে, তাও আমি তাকে ভূত বলে বিশ্বাস করব না। কারণ আমি জানি, প্রকৃতিতে তা সম্ভব নয়। এই জঙ্গলে অনেক চোর-ডাকাত গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, তারাই রণছোড়ের মতন ভিতুদের ভয় দেখায়।

একটু টলটলে পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে মেঘুদা বীরবিক্রমে বলল, তুই কোন শালা রে ! বাঁচতে চাস তো এ দিকে আয়। আমি ঠিক পাঁচ গুনব, নইলে—

এরপরই সেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটি ঘটল। মেঘুদার চেঁচামেচিতে সেই মানুষের মতন প্রাণীটি এ দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। তারপর সোজা এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

মেঘুদা রাইফেল উঁচিয়ে তৈরি হয়ে আছে। লোকটির চোখ ভাটার মতন জ্বলছে না, সাধারণ মানুষেরই মতন, তবে একটু দুলে দুলে হাঁটছে। চুনিলালবাবু ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, আপনি কে ? আপনার কোনও ক্ষতি করতে চাই না আমরা—

মেঘুদা বলল, এবার আমি ঠিক গুলি চালাব। এক দুই তিন

মেঘুদার হাত থেকে রাইফেলটা খসে পড়ে গেল। মেঘুদার শরীরটা দাঁড়ানো অবস্থায়ই একটু একটু কাঁপছে। কোনও কথা বলতে পারছে না আর।

শোনা যায়, সামনাসামনি ভূত দেখলে সবাই ঠকঠকিয়ে কাঁপে। আমিও কাঁপছি, তবু সেই অবস্থাতেই যেন বুঝতে পারছি, এটা ঠিক ভয়ের ঠকঠকানি নয়। শরীরটা যেন নিজের বশে নেই। গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ।

সেই প্রাণীটি এসে মেঘুদার বুকে একটা ঠেলা মারল, মেঘুদা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল।

শুধু ঠেলা মারা ছাড়া মেঘুদাকে আর কোনও আঘাত দেবার ইচ্ছে

তার দেখা গেল না। সে আমাদের মতন চুনোপুঁটিদেরও বলল না কিছু। রণছোড়জি রাম রাম রাম রাম করছে, সেই প্রাণীটির তা যেন কানেই গেল না।

আমাদের ছাড়িয়ে সে ঢুকে গেল গভীর জঙ্গলের মধ্যে।

॥ তিন ॥

আমাদের ঘুম ভাঙল বেলা দশটার পর। না, জঙ্গলে নয়, বাংলোর বিছানাতেই।

কাল কী করে যে ফিরেছি, তা যেন এক দুঃস্বপ্নের মতন। আলবেলি ঝাপটার কাছে কী যে ঠিক ঘটেছিল, তা এখনও সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হয়ে আছে। সত্যি কি ভূত দেখেছি ? এখনও বিশ্বাস হয় না। যাকে দেখেছি, তার অবিকল মানুষেরই মতন চেহারা, অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, তবু সে কি সত্যি মানুষ ? গুলি চালাবার হুমকি শুনেও সে ভয় পেল না, আমাদের দিকেই এগিয়ে এল, কোনও সাধারণ মানুষ কি এত সাহস পাবে ? মেঘুদা গুলি চালানো দূরের কথা, একটা ফাঁকা আওয়াজও করতে পারল না। রাইফেলটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল কেন ?

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছিল মেঘুদার। ভূতের ভয়ের চেয়েও মেঘুদার অবস্থা দেখে আমরা বেশি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। মেঘুদা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, মাটিতে পড়ে গিয়ে কাতরাচ্ছিল আর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। চোখে-মুখে অনেক জলের ছিটে দেওয়াতেও কিছু হল না। মানুষের মতন সেই প্রাণীটি যখন কাছে এসেছিল, তখন আমরা সবাই শরীরে একটা চিড়বিড়ে ভাব অনুভব করেছিলুম, কিন্তু মেঘুদার ওপরে প্রতিক্রিয়াই হয়েছিল খুব বেশি।

তখন ফেরার সমস্যা নিয়ে মহা চিন্তা হল। মেঘুদাকে ধরাধরি করে তোলা হল জিপে, কিন্তু তার অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না, আমাদের অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া দিল না। গাড়ি চালাবার মতন অবস্থা তার নেই। আমরা চাইছিলুম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখান থেকে সরে পড়তে। আমি এক সময় গাড়ি চালানো শিখেছিলুম বটে, কিন্তু নিজেদের তো গাড়ি নেই, তাই চালাবার অভ্যেসও নেই, তা ছাড়া কোনওদিন জিপ চালাইনি, লাট্টু গিয়ারে প্র্যাকটিস করিনি। ঠ্যালার নাম বাবাজি, আর কোনও উপায় তো নেই, আমি বসেছিলুম স্টিয়ারিংয়ে। গিয়ার পাল্টাতে গিয়ে বারবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, কয়েকবার গাছে গুঁতোগুঁতো খেয়েও শেষপর্যন্ত পৌঁছে গেছি কোনওরকমে।

মেঘুদার সেই একই রকম অবস্থা। তাকে শুইয়ে দেওয়া হল বিছানায়। চুনিলালবাবুও এখানেই থেকে গেলেন।

আমরা জেগে ওঠার পরও মেঘুদার ঘুম ভাঙল না। মেঘুদার ঘরে বসেই আমরা দু' কাপ চা শেষ করলুম, মেঘুদা একভাবে চিত হয়ে শুয়ে আছে, আমাদের কথাবার্তাতেও তার ঘুমের কোনও বিঘ্ন হচ্ছে না।

চুনিলালবাবু উদ্বিগ্নভাবে বললেন, রঙ্গলাল ডাক্তারকে ডেকে আনব নাকি নীলুভাই ?

আমি উঠে গিয়ে মেঘুদাকে জোরে জোরে ঠেলা দিয়ে ডাকলুম, মেঘুদা, ও মেঘুদা ?

বেশ জোরে জোরে কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর মেঘুদা চোখ মেলল। চোখদুটি অস্বাভাবিক টকটকে লাল।

মুখে যারা খুব সাহসের ভাব দেখিয়ে তড়পায়, আসল জায়গায় গিয়ে তারা অনেকেই বেশি ভয় পেয়ে নেতিয়ে পড়ে। মেঘুদার ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। তা হলে তো মেঘুদাকে নিয়ে আমরা এতক্ষণে হাসি-ঠাট্টা শুরু করতে পারতুম। কিন্তু প্রথম থেকেই মেঘুদার প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। তা ছাড়া, আমি তো জানি, মেঘুদার সত্যিই ভয়ডর কম আর বিজ্ঞানের ওপর অগাধ বিশ্বাস।

খানিকক্ষণ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকার পর মেঘুদা আস্তে আস্তে বলল, আমি কোথায় ?

মেঘুদার মুখের কাছে মুখ নুইয়ে বললুম, আমরা বাংলোয় ফিরে এসেছি। মেঘুদা, ওঠো, উঠে চা খাও !

মেঘুদা আস্তে আস্তে উঠে বসল। মাথাটা ঝাঁকাল কয়েকবার। আমাদের দেখল। তারপর খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বলল, বাংলোতে ফিরে এসেছি ? আমি গাড়ি চালিয়েছি ?

আমি বললুম, না, তুমি চালাওনি। সে সব কথা পরে শুনবে। আগে চোখ-মুখ ধুয়ে এসো। চা খাও। এখনও শরীর খারাপ লাগছে ?

দু' দিকে মাথা নেড়ে মেঘুদা খাট থেকে নামল। পাশের বাথরুমে গিয়েও ফিরে এল। আচ্ছন্নের মতন ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে। একবার জিজ্ঞেস করল, আমার টুথব্রাশ কোথায় ?

বাথরুমটা মস্ত বড়। কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ির অনেক শোবার ঘর এর থেকে ছোট হয়। দাঁত মাজা, দাড়ি কামানোর সব জিনিস তো সেখানে আছেই, তা ছাড়া রয়েছে জামা-কাপড়ের ওয়ার্ডরোব, একটা ইজি চেয়ার। মেঘুদা সে সব ভুলে গেল নাকি ?

আমি মেঘুদার হাত ধরে ঠেলে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিলুম।

বেশ খানিকক্ষণ পরে মেঘুদা বেরিয়ে এল, একেবারে স্নান করে নিয়েছে। পরিষ্কার পাজামা-গেঞ্জি পরা। এখন অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছে।

টি পটে অনেকটা চা আছে। আমি এক কাপ ঢেলে দিলুম। মেঘুদা চুপচাপ কয়েক চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর খুব চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করল, কালকে ঠিক কী হল বল তো ?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রণছোড়জি। কাল রাত্রে সে খুবই ভয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু আজ তার চোখে মুখে বেশ গর্বের ভাব। সে গাঁজাখুরি গল্প চালায়নি, তার সাহেবেই সরাসরি ভূতগ্রস্ত হয়েছে।

চুনিলালবাবু আর আমি সহসা কোনও উত্তর দিতে পারলুম না।

মেঘুদা বলল, একটা লোককে আমরা দেখেছি। সবাই দেখেছি, ঠিক তো ? নাকি আমি একলাই দেখেছি ?

আমরা কিছু উত্তর দেবার আগেই রণছোড়জি বলল, সবকোই দেখা। এই এত্ত কাছ থেকে।

মেঘুদা বলল, একটা লোক, কঙ্কাল-ফঙ্কাল নয়, মানুষ, রক্ত-মাংসের মানুষ, সে হেঁটে আসছিল, অর্থাৎ তার মাথা আর শরীরের পেশিগুলো কাজ করছিল, তার মানে জ্যান্ত মানুষ।

রণছোড়জি বলল, স্যার, প্রেতাত্মা অনেক সময় মানুষের রূপ ধরে আসে। সাচমুচ মানুষ বলে মনে হয়।

মেঘুদা প্রচণ্ড চিৎকার করে ধমকে উঠল, চুপ ! তুই একদম চুপ কর এখন।

গলার আওয়াজের তেজ শুনেই বোঝা গেল, মেঘুদার শরীর অনেক সুস্থ হয়ে গেছে। তার মুখে এখন ফুটে উঠেছে নিজের ওপরই রাগের ভাব। একটা খুব সহজ জেতা-খেলা খেলতে গিয়ে হঠাৎ হেরে গেলে যে-রকম হয়।

চুনিলালবাবু বললেন, বিকট কোনও চেহারা নয়, সাধারণ মানুষের মতনই মনে হচ্ছিল বটে।

মেঘুদা বলল, তা হলে আমরা লোকটার সঙ্গে কথা বললাম না কেন ? তার হাতে কোনও অস্ত্র ছিল ? হাতের আঙুলে বড় বড় নখ ছিল ? সে হঠাৎ আমাদের ওপর লাফিয়ে আক্রমণ করতেও আসেনি। তবু আমরা চার-চারটে পুরুষমানুষ কিছুই করতে পারিনি কেন ?

চুনিলালবাবু বললেন, সত্যি কথা বলছি মশাই, ভয়ে আমাদের হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছিল। অন্তত আমার কাঁপছিল।

মেঘুদা ভুরু কুঁচকে বলল, ভয় ? চারজনেরই সমান ভয় ? আমার নাম

মেঘনাদ ঘোষাল। মেঘনাদ কে ছিল জানেন তো, রাক্ষসদের রাজকুমার। আমাকে দেখেই সামান্য ভূত-প্রেতদের ভয় পাবার কথা!

আমি বললুম, মেঘুদা তুমি গুলি চালাবে বলেছিলে। তাই শুনেই ওই ভুতটা, মানে, ওই মানুষটা, আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তার মানে, ও গুলিকে ভয় পায় না। তুমিও গুলি চালালে না।

মেঘুদা বলল, রাইফেলটা আমার হাত থেকে পড়ে গেল। কেন পড়ে গেল? আমি কি সত্যি অত ভয় পেয়েছিলাম? আমি, মেঘনাদ ঘোষাল, সামান্য একটা জংলিকে দেখে ভয় পাব? তারপর কী হল, আমার মনেই নেই!

আমি বললুম, লোকটা তোমার বুকে সামান্য একটা খোঁচা মেরেছিল। আর কিছু করেনি, আমি দেখেছি। তারপরই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে। আমারও হাত-পা কিছুক্ষণের জন্য অবশ হয়ে গিয়েছিল। তবে কি লোকটা আমাদের সবাইকে হিপনোটাইজ করেছিল? কেউ কেউ নাকি এরকম পারে?

মেঘুদা বলল, একদম বাজে কথা! বাচ্চাদের কমিক্সে এ রকম থাকে। ম্যানড্রেক দা ম্যাজিশিয়ান! এক সঙ্গে চারজন লোককে দু' এক মিনিটের মধ্যে হিপনোটাইজ করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। পি সি সরকার নামে একজন খুব বড় ম্যাজিশিয়ান ছিলেন, এখন যে পি সি সরকার ম্যাজিক দেখায়, তার বাবা। একদিন তিনি একটা হলে ছ'টার বদলে সাড়ে ছ'টায় এসে উপস্থিত হলেন। আধ ঘণ্টা লেট। দর্শকরা আপত্তিতে গুজ গুজ করছিল। পি সি সরকার দেরির জন্য ক্ষমা না চেয়ে বললেন, আপনারা নিজেদের ঘড়ি দেখে বলুন তো ঠিক কটা বাজে? ছটা, না সাড়ে ছটা? সব দর্শক দেখল, তাদের ঘড়িতে তখন ছটা বেজে আছে। অর্থাৎ তিনি হলসুদ্ধ লোককে হিপনোটাইজ করেছিলেন, সবাই ভুল দেখেছে। আমরা ছেলেবেলায় এই গল্পটা শুনেছি। আসলে কী হয়েছিল বল তো? কিছুই হয়নি। ও রকম ঘটনা কোনওদিন ঘটেনি। ওটা একটা গল্প। একটা প্রচার। এক সঙ্গে অত লোককে হিপনোটাইজ করা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়!

চুনিলালবাবু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, তা হলে, তা হলে আমি বুঝেছি! অন্য গ্রহের প্রাণী! আমার তখনই মনে হচ্ছিল, চোখের দৃষ্টি যেন কেমন কেন! হতে পারে কি না বলুন! অন্য গ্রহের প্রাণী এসে মানুষ সেজে আছে।

মেঘুদা চুনিলালবাবুর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, আমি বা রণছোড়জি এ রকম কথা বললে আবার

বকুনি খেতুম। কিন্তু চুনিলালবাবুকে কেউ ধমক দেয় না। তাই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মেঘুদা বলল, সায়েন্স ফিকশান? কল্পবিজ্ঞান? দেখুন চুনিলালবাবু, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশের বৈজ্ঞানিকরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনও গ্রহ-উপগ্রহে সামান্য প্রাণের চিহ্ন খুঁজে পায়নি। অবশ্য মহাশূন্যের সামান্য অংশই মানুষ এখনও পর্যন্ত জানতে পেরেছে। তার বাইরে কত কী থাকতে পারে। কিন্তু যতদিন না বিজ্ঞানীরা কিছু প্রমাণ পাচ্ছেন, ততদিন আমাদের ও রকম কিছু বিশ্বাস করা মূর্খতা! পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কোথাও মহাশূন্য থেকে কোনও প্রাণী কিংবা কোনও রকেট ফকেট এসেছে, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আর আমাদের এই পাতাপাহাড়ীতেই একটা অন্য গ্রহের প্রাণী এসে গেল? হলিউড এ রকম অনেক সিনেমা বানায়, উদ্ভট উদ্ভট প্রাণীরা টপাটপ পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে, এসব দেখে আমাদের মনের মধ্যে যে একটা শিশু আছে, সে খুব উত্তেজিত হয়। বুঝলেন? অন্য গ্রহের প্রাণী-টানি নিয়ে আমাদের এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

চুনিলালবাবু অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, আমি কিন্তু আপনার কথা বুঝলাম না। আপনি বলছেন, ভূত হতে পারে না। জ্যান্ত মানুষ। সে আমাদের মারধোর করল না, তবু আমরা কাবু হয়ে গেলাম। আপনি একেবারে ফ্ল্যাট। তা কী করে হয়? আপনি বলছেন, অন্য গ্রহের প্রাণীও হতে পারে না। তা হলে ওটা কী?

মেঘুদা বলল, স্বীকার করছি, আমি সবজান্তা নই। বিজ্ঞান যতটা যা প্রমাণ করতে পেরেছে, তার বাইরেও অজানা অনেক কিছু রয়ে গেছে। কাল রাত্তিরে যা ঘটে গেল, তার ব্যাখ্যা এখনও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। সেইজন্যই আজ রাত্তিরে আমরা আবার ওইখানে যাব। আবার দেখতে হবে।

চুনিলালবাবু বললেন, মেঘুবাবু, আমি একটা বইতে পড়েছি, দেবতারা অন্য গ্রহের মানুষ। যাকে আমরা স্বর্গ বলি। দেবতারা নানা রকম রূপ ধরতে পারেন, তাদের চেহারা হয়তো অন্যরকম, আমাদের কাছে মানুষ সেজে আসেন।

মেঘুদা বলল, এ সবই গল্প। পড়তে আমাদের ভাল লাগে। ভাবতেও ভাল লাগে। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কিংবা শরীর পাল্টে ফেলা, এ সবও কল্পনা করতে ভাল লাগে। ওসব কল্পনাতেই মানায় ভাল। বাস্তবে কোনও দিন সম্ভব হবে না। ধরুন, আপনার এই যে শরীরটা, এর অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা বাদই দিলাম, শুধু আপনার মস্তিষ্কে কত সেল আছে জানেন? দশ বিলিয়ান! অর্থাৎ এক হাজার কোটি, এর কিছু সেল

এদিক-ওদিক হয়ে গেলে আপনি আর চুনিলালবাবু থাকবেন না, অন্য কিছু হয়ে যাবেন। আপনি যদি অন্য কোনও রূপ ধারণ করেন, তারপর আবার চুনিলালবাবু হিসেবে ফিরে আসতে হলে ওই এক হাজার কোটি সেলকে আবার ঠিক ঠিক জায়গায় বসাতে হবে। কোনও দেবতার বাপের সাধ্য নেই তা করার। কাজেই ওসব কল্পনায় থাকাই ভাল।

এবার আমি বললুম, মেঘুদা, বড্ড বেশি টেকনিক্যাল কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে। আজ রাত্তিরে আবার গিয়ে দেখাই ভাল। কাল রাত্তিরে কিন্তু আর একটা ব্যাপার আমার খুব অদ্ভুত লেগেছে। আমি আর রণছোড়জি শিমুল গাছটা খুঁজে পাইনি।

মেঘুদা বলল, খুঁজে পাসনি মানে?

রণছোড়জি বলল, ওই গাছটা গায়েব হয়ে গেছে।

আমি বললুম, ওখানে একটা মস্ত বড় শিমুল গাছ ছিল মনে আছে?

মেঘুদা বলল, মনে থাকবে না কেন? আমার জঙ্গল আমি নিজের হাতের পাতার মতন চিনি। ওই গাছটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

আমি বললুম, আমরা দু' জনে আলবেলি ঝাপটার চারদিক ঘুরে দেখেছি, কিন্তু শিমুল গাছটা দেখতে পেলুম না। গাছটা হাওয়া হয়ে গেছে।

মেঘুদা চড়া গলায় বলল, কী পাগলের মতন কথা বলছিস? গাছ আবার হাওয়া হয় কী করে? হয় গাছটা সেখানেই আছে, তোদের দেখার ভুল হয়েছে, অথবা গাছটা কেউ কেটে ফেলেছে।

আমি বললুম, অত বড় একটা গাছ কেটে ফেললে তার কোনও চিহ্ন থাকবে না? কিছুই তো দেখলুম না!

মেঘুদা বলল, দিনেরবেলা গিয়ে দেখতে হবে! তা হলে চল, এক্ষুনি যাওয়া যাক।

চুনিলালবাবু বললেন, এখন যাবেন কী, আপনার শরীর খারাপ—

মেঘুদা বলল, কে বলেছে আমার শরীর খারাপ? আমি ঠিক আছি। তার আগে একটা কথা শুনে রাখুন। রণছোড়, তোকেই বিশেষ করে বলছি। কাল রাতে কী ঘটেছে, তা যেন কাকপক্ষীতেও টের না পায়। কিসিকো মাৎ বোল না! অন্য কেউ শুনলেই মুখে মুখে গল্প ছড়াবে, আরও রং চড়বে, ডি এফ ও সাহেবের কানে গেলে তিনি ভাববেন, আমিও একটা কুসংস্কারগ্রস্ত বেওকুফ! এখন কেউ যেন কিছু জানতে না পারে।

দরজার আড়াল থেকে চিখরিয়া বলল, আমি সব শুনেছি। বলেছিলাম না বনদেব্‌তা। তোমাদের কোনও ক্ষতি করেনি। ভূত হলে

ঘাড় মটকে দিত!

মেঘুদা বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, বনদেবতা বলেই এখন ধরে নিলাম। কিন্তু চিখরিয়া, তুমি চতুর্দিকে চিৎকার করে এ কথাটা এখন বলতে যেও না!

চিখরিয়া বলল, আমার বলার কী দায় পড়েছে! আমিও ওই বনদেব্‌তাকে তিন-চারবার দেখেছি, আমি ভয় পাইনি। বনদেব্‌তা বনের মধ্যে একা একা কাঁদে।

চুনিলালবাবু বললেন, কালকেও আমি প্রথমে একটা কান্নার মতন শব্দ শুনেছিলাম।

চিখরিয়া বলল, তোমরা এখন কোথা যাবে? ওসব চলবে না। খানা পাকানো হয়ে গেছে, আমি কি তোমাদের জন্য হাঁ করে বসে থাকব? খাবার খেয়ে তারপর যাবে।

এই প্রস্তাবটাই আমাদের ঠিক বলে মনে হল। সকালে কিছু নাস্তা খাওয়া হয়নি, খিদেও পেয়েছে।

কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পরই বেরুনো হল না। একজন আর্দালি এসে খবর দেওয়ায় মেঘুদাকে একবার অফিসে যেতে হল। আমরা বাকি ক'জন একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু আমার কিছুতেই ঘুম এল না। বারবার মনে পড়ছে গত রাত্তিরের ঘটনা। এ পর্যন্ত আমি কোনও অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিনি। গভীর রাতে ফাঁকা কোনও জায়গায় কিংবা একলা কোনও বাড়িতে থাকলে ভয়ে গাটা একটু ছমছম করে বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি ভূতপ্রেতে আমার বিশ্বাস নেই।

মেঘুদা ফিরে এসে বলল, ডি এফ ও সাহেব সামনের সপ্তাহে তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে আসছেন। তার আগে এই ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলতে হবে। একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। আর একটা খবর পেলাম। চৌধারিবাবুর লোকজন ক্যাম্পে ফিরে এসেছে, ওরা আবার কাজ শুরু করেছে। ওই জায়গাটা একবার ঘুরে যাওয়া দরকার।

বেরুতে বেরুতে বিকেল হয়ে গেল। জিপের গিয়ারটায় ঘটঘটাং শব্দ হচ্ছে। সেটা নাকি আমারই দোষ। আনাড়িরা গাড়ি চালাতে গেলে এরকমই হয়। মেঘুদা আমাকে বকাবকি করতে লাগল, চুনিলালবাবু আমার পক্ষ নিয়ে বললেন, তবু তো নীলুভাই ড্রাইভিং কিছুটা শিখে রেখেছিল বলে কাল রাত্তিরে আমরা ফিরে আসতে পেরেছি। নইলে ওই ভূতের জায়গাতেই পড়ে থাকতে হত।

মেঘুদা বলল, আবার আপনি ভূত বলছেন?

চুনিলালবাবু বললেন, ভুল হয়ে গেছে, বনদেবতা। আচ্ছা মেঘুবাবু, কাল আপনি যে বলছিলেন, গাছেরা মিথ্যে কথা বুঝতে পারে, সেটা কি ঠিক ?

মেঘুদা বলল, আমি বাজে কথা বলতে যাব কেন ?

চুনিলালবাবু বললেন, গাছেরা কী বুঝতে পারে, সেটা আপনি কী করে বুঝবেন !

মেঘুদা বলল, শুনুন তা হলে। লাই ডিটেকটার বা মিথ্যে মাপার একটা যন্ত্র আছে। অনেক দেশের পুলিশরা এটা ব্যবহার করে। মনে করুন, চুরি-টুরি বা খুনের সন্দেহ করে একজন লোককে ধরে আনা হল। তারপর তাকে জেরা করার সময় তার গায়ে সেই যন্ত্রটার একটা তার লাগিয়ে দেওয়া হয়, এক দিকের তারের ডগায় থাকে একটা সরু সুচ বা কলম। লোকটিকে নানা রকম প্রশ্ন করার সময় ওই যন্ত্রটা দিয়ে মৃদু বিদ্যুৎতরঙ্গ ওর শরীরে যায়, ওর মনের নানা রকম প্রতিক্রিয়া অন্যদিকের তারের সরু সুচ বা কলম দিয়ে একটা কাগজের ওপর দাগ কাটে। সেই দাগগুলো দেখলে বোঝা যায়, সে মিথ্যে কথা বলছে না সত্যি কথা বলছে। হার্টের অসুখ হলে ই সি জি করে, তা দেখেছেন কখনও ! তাতেও একটা লম্বা কাগজে নানা রকম আঁকাবাঁকা দাগ ফুটে ওঠে, সেই দাগ দেখে ডাক্তাররা বুঝতে পারেন যে হার্টের অবস্থা কেমন। তেমনি এই পলিগ্রাফ যন্ত্রটা মানুষের মাথার মধ্যে যেসব চিন্তা ঘুরছে, তা বুঝিয়ে দেয়।

চুনিলালবাবু বললেন, এ তো বললেন মানুষের কথা।

মেঘুদা বলল, হ্যাঁ। ব্যাকস্টার নামে একজন পুলিশ অফিসার ছিল নিউ ইয়র্ক শহরে। তার কাজ ছিল, ওই লাই ডিটেকটর যন্ত্রটার ব্যবহার অন্য পুলিশদের শেখানো। একদিন রাত্তিরে সেই ব্যাকস্টার সাহেব নিছক খেয়ালে ঘরের মধ্যে একটা ফুলগাছের গায়ে সেই যন্ত্রটা লাগিয়ে দিলেন। তারপর গাছটার গোড়ায় জল ঢেলে দিলেন খানিকটা। তারপরই ব্যাকস্টার দারুণ অবাক হয়ে গেলেন। কাগজের গায়ে আঁকিবুঁকি দাগ পড়ছে, একজন মানুষ হঠাৎ খুশি হলে যেরকম হয়, ঠিক সেই রকম। এবার বুঝলেন ?

চুনিলালবাবু বললেন, মিথ্যে কথার ব্যাপারটা এখনও বুঝলাম না। নীলুভাই, তুমি বুঝেছ ?

আমি উত্তর দেবার আগেই মেঘুদা বলল, ও বুঝবে কী করে, ও কি আপনার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ? এটা তো বুঝলেন, গাছ আনন্দ পায়, দুঃখ পায়, ভয় পায় তার মানেই গাছ চিন্তা করে। সবাই ভাবে, গাছের

মস্তিষ্ক বলে কিছু নেই। মস্তিষ্ক না থাকলে চিন্তা করবে কী করে ? অথচ সত্যি সত্যি করে। মানুষের চেয়ে বেশিই করে। এবার শুনুন, আরও তাজ্জব ব্যাপার। ব্যাকস্টার ভাবলেন, ওই ফুলগাছটার একটা পাতা আগুনে পুড়িয়ে দিলে কেমন হয়। গাছ তাতে নিশ্চয়ই ভয় পাবে, ব্যথা পাবে। কতটা ভয় আর ব্যথা পাবে, তা একবার দেখা যাক তো ! ব্যাকস্টার এই কথা ভেবেছেন মাত্র, তখনও চেয়ার ছেড়ে দেশলাই আনতে যাবার জন্য ওঠেননি, তাতেই কাগজের গায়ে ঘন ঘন রেখা পড়তে লাগল। ঠিক ভয় পাবার চিহ্ন। অর্থাৎ ব্যাকস্টার কী চিন্তা করছেন সেটাই গাছ বুঝে ফেলল। মানুষ কি পারে, অন্যের চিন্তা বুঝতে ? ব্যাকস্টার আরও পরীক্ষা করার জন্য আরও কয়েকবার গাছটাকে মিথ্যেমিথ্যি ভয় দেখাতে চাইলেন, আমি তোমার একটা পাতা পোড়াব ! তখন কিন্তু গাছটা ভয় পেল না। ব্যাকস্টার যে সত্যি সত্যি তার পাতা পোড়াবে না, এটাও সে বুঝে যাচ্ছে !

চুনিলালবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, বলেন কী মশাই !

মেঘুদা বলল, এর পর আরও পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঘরের মধ্যে কেউ মিথ্যে কথা বললে গাছ ঠিক বুঝতে পারে। সেটা ওই যন্ত্রে ধরা পড়ে।

রণছোড়জি বলল, আমি মিছে কথা বলিনি।

চুনিলালবাবু বললেন, না, না, রণছোড়জি, আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। তা তো প্রমাণ হয়ে গেছে।

মেঘুদা বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এই যে এত গাছপালা দেখছেন, এরাই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

চুনিলালবাবু বললেন, হ্যাঁ, বেশির ভাগ খাদ্যই তো আমরা গাছপালা থেকে পাই। আপনারা যে মাংস-টাংস খান, সেইসব প্রাণীও তো গাছপালা খেয়েই বাঁচে।

মেঘুদা বলল, শুধু খাদ্য ? খাদ্যের কথা বাদ দিন। গাছপালা ছাড়াও খাদ্য তৈরি হতে পারে। একদিন হয়তো সিনথেটিক বড়ি তৈরি হবে, দু'-একটা বড়ি খেলেই খিদে মিটে যাবে। কিন্তু নিঃশ্বাস না নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারবে ? এই যে গাছের পাতাগুলো, এদের অসংখ্য মুখ আছে, সেই মুখ দিয়ে খেয়ে ফেলছে কার্বন ডাই- অক্সাইড, আর বার করে দিচ্ছে অক্সিজেন। পৃথিবীর সমস্ত গাছপালা দিন-রাত খেটে যাচ্ছে আমাদের জন্য অক্সিজেন তৈরি করতে। ভাবুন তো, কোনও একটি দিনের জন্য সব গাছ স্ট্রাইক করল, ফটো সিনথেসিস বন্ধ করে দিল। অ্যাটম বোম, হাইড্রোজেন বোম ফেলার দরকার হবে না, সেই একদিনে মনুষ্যজাতি

নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে !

চুনিলালবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ ! গাছ আমাদের এত উপকারী বন্ধু, তবু সেই গাছকে আমরা কত অবহেলা করি !

মেঘুদা বলল, ব্যাপারটা ঠিক ওরকম নয়। ডারউইন সাহেব দু'খানি মোক্ষম তত্ত্ব দিয়ে গেছেন। একটা হচ্ছে, টিকে থাকার জন্য সর্বক্ষণের লড়াই। আর একটা হচ্ছে, জোর যার মুল্লুক তার। প্রকৃতির রাজ্যে এই নিয়ম দুটোই চলছে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মূল্যবোধ এখানে খাটে না। এখন পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেশি, তাই মানুষ সব কিছুর ওপর আধিপত্য করছে। গাছপালারা আমাদের জীবনদায়ী অক্সিজেন দেয় বটে, কিন্তু কোনও-না-কোনও ভাবে গাছপালা ধ্বংস না করলেও মানুষ বাঁচবে না। মনে রাখবেন, ধান-গম, শাক-সবজি কিংবা পেয়ারা বা আপেল, এ সব কিছুই মানুষের জন্য ফলে না। মানুষ এগুলো জোর করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। ধানগাছও অক্সিজেন দেয়, তা বলে কি ধান গাছ কাটা হবে না ? একটা ধানগাছ আর একটা ফুলগাছের মধ্যে আসলে কোনও তফাত নেই। মানুষ নিজের হাতে বীজ ছড়িয়ে ধানগাছ জন্মায়, আবার নিজের হাতেই ফলসুদ্ধু সেই ধানগাছ কাটে। আপাতত এটাকে নিষ্ঠুর ব্যাপার মনে হবে না ? অথচ ধান-গমের মতন ফসল ফলানো যেদিন মানুষ শিখল, যে ফসল জমিয়ে রাখা যায়, সে দিন থেকেই মানুষের সভ্যতার জন্ম হল। বাঘ-ভাল্লুক বা কুকুর-বেড়ালের মতন মানুষকেও যদি প্রত্যেক দিন খাদ্যের সন্ধানে বেরুতে হত, তা হলে মানুষের কাব্য-সাহিত্য-গান-বাজনা-বিজ্ঞান এসব কিছুই হত না।

আমি একটু অন্যমনস্কভাবে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে আসছে, অরণ্যের সবুজ সেই লালের সঙ্গে মিশে একটা অন্য রং হয়ে যাচ্ছে। এক একটা গাছে অনেক পাখি, এক একটা গাছে একটাও পাখি নেই। একটা শুকনো নালার কাছে ওড়াউড়ি করছে ঝাঁকেঝাঁকে ফড়িং।

হঠাৎ খটাখট শব্দ শুনে চমকে উঠলুম। একটা ঘোড়া ছুটে আসছে, তার সওয়ারি একটি রমণী। জিপটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলুম, চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবতী, জবরজং হলদে-নীল-গোলাপি রং মেশানো শালোয়ার-কামিজ পরা, মাথার চুল লাল রিবন দিয়ে বাঁধা, হাতে একটা ছপটি। এবড়োখেবড়ো রাস্তা বলে জিপটা যাচ্ছে আস্তে আস্তে, ঘোড়াটা ছুটছে বেশ জোরে।

মেঘুদা আর চুনিলালবাবু জ্ঞানের কথা আলোচনা করতে করতে থেমে

গেলেন। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই চুনিলালবাবু বললেন, রংমতী, সে এখানে কী করছে ?

রণছোড়জি বলল, ও লেড়কি এখন বাপের কারবার দেখ্‌ভাল করে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, রংমতী কে ?

চুনিলালবাবু বললেন, ভূষণ চৌধারির কন্যা। ভূষণবাবুর এত বড় ব্যবসা, কিন্তু ছেলে নেই। তিনটি কন্যা। দ্বিতীয় বিয়ে করলেন, সেখানেও কন্যা সন্তান জন্মাল। তবে রংমতী অনেক পুরুষের চেয়েও জবরদস্ত।

ঘোড়া সমেত যাত্রিণীকে এখনও দেখা যাচ্ছে। আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে একবারও এদিকে তাকায়নি। জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে এক যুবতী। এ যেন হিন্দি সিনেমার দৃশ্য। হয়তো ওই সব সিনেমা দেখেই এই মেয়েটি ঘোড়া চালানোতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। শিল্প জীবনকে অনুকরণ করে, না জীবন শিল্পকে অনুকরণ করে, এই নিয়ে একটা তর্ক আছে না ? অবশ্য হিন্দি সিনেমাকে কি শিল্প বলা যায় ?

গাছ-কাটার ক্যাম্প বেশি দূরে নয়। সেখানে পুরোদমে কাজ চলছে। কিন্তু গাছের গায়ে কুড়ুলের ঘায়ের খটখটাং শব্দের বদলে ক্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ ধরনের যান্ত্রিক শব্দ শুনতে পেলুম।

আমরা জিপ থেকে নামতে না-নামতেই ঝপাস করে একটা শাল গাছ শুয়ে পড়ল।

রংমতী নামে সেই মেয়েটি ঘোড়া থেকে নামেনি, হাতের ছপ্‌টিটা তুলে শ্রমিকদের নির্দেশ দিচ্ছে। আমাদের দেখে সে বলল, নমস্তে, নমস্তে চুনিলালবাবু। কাল রাতে আপনারা নাকি ভূত দেখতে বেরিয়েছিলেন ? কিছু দেখতে পেলেন ?

চুনিলালবাবু দুর্বলভাবে হেসে বললেন, না। মানে সে রকম কিছু দেখিনি।

রংমতী বলল, আজ রাতে আমি নিজে এখানে থাকব। দেখব, কোন শালা ভূত এসে হামলা করে। খোপরি উড়িয়ে দেব !

বুকে ছোট্ট একটা ধাক্কা খেলুম। মেয়েরা কেউ কখনও শালা বলে না এমন নয়। মেয়েরা গালাগালি জানে না, একথা বললে সত্যের অপলাপ হয়। কিন্তু দেখতে যদি খারাপ হত, আর বয়েসটা বেশি হত, তা হলেই যেন গালাগালি মানায়। এই রংমতী হিন্দি সিনেমার নায়িকা হিসেবে বেমানান হবে না, চোখা নাক, টানা টানা চোখ, রংটাও মাজা মাজা, কিন্তু মুখে যেন ইচ্ছে করেই একটা পুরুষালি ভাব এনেছে।

যে-শালগাছটা এইমাত্র কাটা হল, মেঘুদা তার গোড়াটা পরীক্ষা করে

দেখল। কুড়ুল নয়, ইলেকট্রিক করাত দিয়ে মসৃণভাবে কাটা হয়েছে। এই পাতাপাহাড়ীতেও এরা এত আধুনিক ? ইলেকট্রিক করাত ! চলে অবশ্য ব্যাটারিতে। কুড়ুলও আছে। কয়েকজন কাঠুরে কুড়ুল দিয়ে এখন ডালপালা ছাঁটছে।

চুনিলালবাবু রংমতীকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা কেমন আছেন ? জ্বর হয়েছে শুনেছিলাম।

রংমতী বলল, টাইফয়েড মালুম হচ্ছে। কাম-কারবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমি সব দেখব এখন থেকে। দুটো মেশিন আনিয়েছি, তাড়াতাড়ি হবে। বর্ষার আগে শেষ করে ফেলব।

চুনিলালবাবু বললেন, হ্যাঁ, একজনকে তো তদারক করতে হবে। নইলে কাজ এগুবে কী করে !

ফরেস্ট রেঞ্জার হিসেবে মেঘুদা যে-সব গাছের গায়ে দাগ মারা আছে সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলেন। একটা সেগুনগাছের চারায় হাত বুলোতে বুলোতে একজন শ্রমিককে বললেন, দেখিস, অন্য গাছ কাটার সময় যেন এগুলোর ওপর এসে না পড়ে।

তারপর একটু থেমে গিয়ে সেই শ্রমিকটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম ঝরি সিং না ?

লোকটি হাত জোড় করে বলল, জি হুজুর।

রণছোড়জি পাশ থেকে বলল, এই ঝরি সিংয়েরই গলা টিপে ধরেছিল ভূতে।

লোকটির মুখখানা শুকনো ধরনের, চোখ দুটো গর্তে ডোবা। এখনও ওকে অসুস্থ মনে হয়। কিন্তু গরিব মানুষ, বিছানায় শুয়ে থাকলে ওর চলবে কেন ? তাই আবার কাজে এসেছে।

মেঘুদা জিজ্ঞেস করল, সেদিন ঠিক কী হয়েছিল বলো তো।

ঝরি সিং ভিতু ভিতু ভাবে একবার পেছন দিকে তাকাল। তারপর মিনমিনে গলায় বলল, আমি কিছু জানি না হুজুর। মালিক আমাদের যে-গাছ কাটতে বলে সেই গাছ কাটি।

মেঘুদা বলল, দিনের বেলা কাটো, না রাত্তিরেও কাজ করতে হয়।

ঝারি সিং বলল, না হুজুর, পাঁচ বাজলে পর ছুট্টি। ওই তো লছমন সর্দার আমাদের ছুট্টি করে দেয়। তারপর রুটি পাকাই।

মেঘুদা বলল, যে তোমার গলা টিপে দিয়েছিল, সে কি জোয়ান না বুড়ো ? ভাল করে দেখতে পেয়েছিলে ?

ঝরি সিং বলল, তাগড়া জোয়ান না আছে, বুঢ্ঢা ভি না আছে। লেকিন তাগদ আছে খুব।

মেঘুদা বলল, শুধু গলা টিপে ধরেছিল, কিছু কথা বলেনি ?

ঝরি সিং একটু চিন্তা করে বলল, বাংলায় বাত্ করছিল। বলছিল, কেন, কেন, কেন ?

মেঘুদা বলল, তাঁবুতে তুমি একলা ছিলে, না আরও কেউ ছিল ?

ঝরি সিং বলল, আরও দু'জন ছিল হুজুর। হামলোগ একই কাম করতা, মেরা কেয়া কসুর ?

রংমতী দূর থেকে ধমক দিল, আরে ঝরিয়া, গপ্সপ্ বন্ধ কর ! কাম শুরু কর !

তারপর সে অকারণেই হাতের ছপ্টিটা চাবুকের মতন তুলে একটা গাছের গায়ে মারল।

রংমতীর আসল নাম নিশ্চয়ই রঙ্গমতী। কিন্তু তার ব্যবহারে রঙ-ঢঙের কোনও স্থান নেই। এমন কঠোর ধরনের যুবতী আমি আগে কখনও দেখিনি। আর একটা ব্যাপারও লক্ষ করলুম, রংমতী আর মেঘুদা পরস্পর একটাও সরাসরি কথা বলেনি। কেউ কারুর দিকে তাকায়নি।

॥ চার ॥

আলবেলি ঝাপটায় পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেলেও আলো একেবারে মরে যায়নি। জঙ্গলের ওপর দিকে কিছুটা আলোকিত, নীচে অন্ধকার। প্রথমেই আমরা জলাটার চারদিক ঘুরে দেখলুম। এবড়োখেবড়ো জমি, মাঝে মাঝে পাথুরে ঢিবি, বর্ষার সময় জল অনেকটা উপছে আসে বলে এদিককার গাছগুলোও বড়বড়। সবচেয়ে বড় শিমুলগাছটা সত্যিই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

গাছটা অবিকল কোথায় ছিল তা তো জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে মেঘুদা আর রণছোড়জি দু' জনেরই ধারণা, গাছটা ছিল জলাটার দক্ষিণ কোণে। সেখানে উঁচু উঁচু দুটো পাথরের ঢিবি রয়েছে, গাছটার চিহ্নমাত্র নেই। অত বড় একটা গাছ কাটলেও তার গোড়াটা তো থাকবে ! একটু দূরে দূরে আরও তিনটে শিমুল গাছ আছে, তা হলে সেগুলোর কোনও একটার সঙ্গে ভুল হচ্ছে ?

রণছোড়জি কিছুতেই তা মানতে রাজি নয়। তার দৃঢ় ধারণা, প্রথম দিন যে শিমুল গাছটার কাছে সে ভূত দেখেছিল, সেই গাছটাই অদৃশ্য।

মেঘুদা বলল, এ যে দেখছি ভূতের চেয়েও বেশি রহস্যময় ব্যাপার !

চুনিলালবাবু বললেন, নিশ্চিত দৃষ্টিভ্রম। গাছটাও ভূত হয়ে গেছে, এ কি কখনও মানা যায় ! কী মেঘুবাবু, আপনার বিজ্ঞানে কী বলে ? গাছ

অদৃশ্য হতে পারে ?

মেঘুদা সংক্ষেপে, দৃঢ়ভাবে বলল, না। সে রকম কিছু পড়িনি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, মেঘুদা, তোমার ওই কন্ট্রাক্টটাররা নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি গাছ কাটে, তা তোমরা ধরতে পারো ? তোমাদের কোনও লোক তো সঙ্গে থাকে না।

মেঘুদা বলল, আমাদের কোনও ফরেস্ট গার্ডকে ডিউটি দিলেও বিশেষ লাভ হয় না। এ দেশের খবর তোরা কতটুকু রাখিস! বিশ-পঞ্চাশ টাকা দিলেও তার লোভ ক'জন সামলাতে পারে ? কিছু বেশি গাছ ওরা কাটবেই। শুধু ওরা কেন, বাইরে থেকে লোক এসেও গাছ কেটে নিয়ে যায়। এই জঙ্গলেও কিছু কিছু লোকবসতি আছে। এ দেশের বহু লোকের কয়লা কেনারও সামর্থ্য নেই, তারা বিনা পয়সায় জ্বালানি চায়, তাই গাছ কাটে।

চুনিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মেঘুবাবু, গাছের কি আত্মা আছে ?

মেঘুদা চুনিলালবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন।

চুনিলালবাবু আবার বললেন, আপনি তো বললেন, গাছের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে, মানুষের মন বোঝার ক্ষমতা আছে। তাই ভাবছিলাম, গাছের মানুষের মতন আত্মাও আছে কিনা! একটা গাছ কেউ কেটে ফেলল, তার পরও তার আত্মাটা রয়ে গেল, সেই আত্মা প্রতিশোধ নিতে এল

মেঘুদা চাপা ধমকের সুরে বলল, মানুষের আত্মা আছে আপনাকে কে বলল ?

চুনিলালবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, সে কী, মানুষের আত্মা থাকে না ? নৈনং ছিদ্রান্তি পাবক...

আমি বললুম, এইসব আলোচনা আমার একদম ভাল লাগে না!

মেঘুদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে। চুনিলালবাবু, আমি আত্মা বিষয়ে কিছু জানি না। শুধু এইটুকু জানি, আত্মা বলুন, হৃদয় বলুন, মেধা বলুন, সব কিছুরই যাবতীয় কুদরতি বেঁচে থাকার সময়। গাছ বিষয়ে যা যা বলেছি, সেগুলি কি আপনি ঠাট্টা ভাবছেন ?

চুনিলালবাবু একেবারে মরমে মরে গিয়ে বললেন, আরে না, না, সে কী বলছেন! আপনি বিদ্বান মানুষ, আপনার কথা শুনে চমকে চমকে উঠছি। অবিশ্বাস করিনি। তবে কী জানেন, বহুকালের সংস্কার... আমাদের মনের মধ্যে যে অজ্ঞানতার তিমির তা সহজে ভেদ করা যায় না

মেঘুদার হাত জড়িয়ে ধরে তিনি ব্যাকুলভাবে বললেন, আপনি রাগ

করেননি তো আমার কথায় ? গাছের আত্মার প্রতিশোধের কথাটা বলা আমার ভুল হয়েছে ? মাপ করে দিন এবারের মতন।

মেঘুদা বলল, ঠিক আছে। ঠিক আছে।

চুনিলালবাবু বললেন, গাছ মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে। এবার থেকে এক একটা গাছের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব।

মেঘুদা বলল, আগেকার দিনের মুনি-ঋষিরা গাছতলায় বসে তপস্যা করতেন। সেটা এমনি এমনি নয়। গাছের কাছ থেকে তাঁরা অতিরিক্ত শক্তি পেতেন। আপনি একটা খুব সহজ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। একটা কোনও গাছ থেকে দুটো পাতা ছিঁড়ে নেবেন। বড় ধরনের পাতা হলে ভাল হয়। যেমন ধরুন মানি প্ল্যান্ট আর রবার গাছের পাতা। এর মধ্যে একটা পাতা রাখবেন বসবার ঘরে, আর একটা পাতা রাখবেন আপনার শোবার ঘরে। শোবার ঘরের পাতাটার সামনে রোজ সকালে উঠে খানিকক্ষণ বসে মনে মনে বারংবার বলবেন, তোমাকে ছিঁড়ে ভুল করেছি, তুমি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকো, চলে যেও না, বেঁচে থাকো। আর দ্বিতীয় পাতাটার দিকে একবারও তাকাবেন না। দিন সাতেক পরে দেখবেন, দ্বিতীয় পাতাটা শুকিয়ে এসেছে, আর প্রথম পাতাটা তখনও অনেক তেজী আছে। দুটো পাতার মধ্যে স্পষ্ট তফাত বোঝা যাবে।

চুনিলালবাবু বললেন, অ্যাঁ ? বলেন কী! সত্যি এ রকম হবে!

মেঘুদা বলল, কথাগুলো আপনাকে খুব আন্তরিকভাবে বলতে হবে। গাছকে সত্যিকারের ভালবাসতে হবে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক এটা পরীক্ষা করে সত্যি হতে দেখেছেন, আবার কেউ কেউ পারেননি।

রণছোড়জি বলল, আজ কিছু খানা আনা হয়নি।

মেঘুদা বলল, হুঁ, আজ বেশিক্ষণ বসব না। রোজ রোজ একই জায়গায় ভূত আসবে, তার কোনও মানে আছে ? কাল ক'টার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল ?

চুনিলালবাবু বললেন, দশটা থেকে সওয়া দশটার মধ্যে।

মেঘুদা বলল, সাড়ে দশটা পর্যন্ত, ব্যস!

আমার প্রথম থেকেই কেন যেন মনে হচ্ছে, আজকে এখানে বসে থাকাটা বৃথা হবে। এরকম মনে হওয়ার ঠিক যে কোনও যুক্তি আছে তা নয়, তবু এরকম মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত সেই লোকটির দেখা পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু একটা আধা অলৌকিক ঘটনা ঘটল ঠিকই।

প্রায় সাড়ে নটার কাছাকাছি আচমকা মেঘ ডেকে উঠল আকাশে। সারা দিন একটুও মেঘ দেখিনি, আজও খানিকটা আগে পর্যন্ত বেশ

জ্যোৎস্না ছিল, হঠাৎই যেন অন্ধকার হয়ে এল। তাতেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম।

রণছোড়জি আজ আর তুলসীদাসের রামায়ণ বুকে বেঁধে আসেনি, একটা রামদা নিয়ে এসেছে। সেই অস্ত্র বলে বলীয়ান হয়েও তার ভয় যায়নি, আমার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরল।

জ্বলে উঠল তিনটে টর্চ। আশে-পাশে কিচ্ছু নেই। শুকনো পাতায় কোনও শব্দ হচ্ছে না। শুধু মেঘ গুরু গুরু করছে, চড়াৎ করে একবার বিদ্যুৎ চমকাল। দু'-তিন মুহূর্তের জন্য সমস্ত জঙ্গলটা আলোকিত হয়েই আবার অন্ধকার। সেই আলোতেও কোনও জীবন্ত প্রাণীকে দেখা গেল না।

মেঘের শব্দটা বাড়তে বাড়তে এক সময় অসম্ভব জোরে একটা শব্দ হল। যেন শত শত কামান দাগা হল এক সঙ্গে। কোথায় যেন বাজ পড়ল, খুব দূরে নয়, আলবেলি ঝাপটার দক্ষিণ কোণে। সেই শব্দে দারুণভাবে বুক কেঁপে ওঠে। সত্যি সত্যি ভয়েরও কারণ আছে। বজ্রপাতের সময় গাছতলায় থাকা বিপজ্জনক, অনেক লোক মারা যায়। আমার নিজেরই এরকম অভিজ্ঞতা আছে। কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট খেলা দেখে ফিরছিলুম, এমন সময় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। আরও অনেকের সঙ্গে আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম রাজভবনের এক কোণে, উল্টো দিকে ওয়ার মেমোরিয়ালে। সেখানেও বৃষ্টিতে পাঁঠা-ভেজা ভিজছি। এমন সময় একটা মিনিবাস আসতেই আমরা কয়েকজন দৌড়লুম। মিনিবাসটা ভিড়ে ভর্তি, থামবে না, তবু মোড় ঘুরবার সময় গতি একটু কমতেই আমি কোনও রকমে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়লুম। ঠিক তখনই বিকট শব্দে বাজ পড়ল খুব কাছেই। পরদিন খবরের কাগজে দেখি যে ওই ওয়ার মেমোরিয়ালেই তিন জন মারা গেছে বজ্রপাতে।

চুনিলালবাবু আমার মনের কথাটাই বললেন, শেষে কি বাজের ঘায়ে মারা যাব ?

মেঘুদা বলল, বসে থাকুন, কিচ্ছু হবে না। এক জায়গায় দু'বার বাজ পড়বে নাকি ?

আরও কয়েকবার বিদ্যুৎ চমকে যেন চিরে গেল সারা আকাশ। তারপর বৃষ্টি নামল।

গাছতলায় দাঁড়ালে বৃষ্টি এড়ানো যায় না। প্রথম প্রথম বৃষ্টি কম লাগে, গাছের পাতায় আটকে যায়, খানিক বাদে দ্বিগুণ তোড়ে জল নামে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। খটখটে গ্রীষ্ম ছিল বলে ছাতা আনার

কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। আমরা এবার দৌড়ে গেলুম জিপটার দিকে।

সেটায় উঠে বসতে না-বসতেই বৃষ্টি থেমে গেল। প্রত্যেকেরই মাথা ভিজেছে। রুমাল দিয়ে খানিকটা মোছা গেল। চুনিলালবাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, মেঘের ডাক শুনে আগে কখনও এত ভয় পাইনি। কী জোর বাজটা পড়ল, কানে যেন তালা লেগে গেছে।

মেঘুদা বলল, মেঘের গর্জন শুনতে আমার ভাল লাগে।

চুনিলালবাবু বললেন, আপনার তো ভাল লাগবেই। আপনি স্বয়ং মেঘনাদ !

রণছোড়জি বলল, সার, আশমানের দিকে একবার দেখুন।

মেঘুদা মাথাটা বার করে বলল, কী, আকাশ দিয়ে কিছু উড়ে-টুড়ে যাচ্ছে নাকি ?

রণছোড়জি বলল, না সার, মেঘ-টেঘ কিচ্ছু নেই। বিলকুল সাফা।

আমিও আকাশ দেখে বললুম, সত্যিই তো! একটুও মেঘ নেই, কয়েকটা তারাও ফুটেছে। এত চটপট সব পরিষ্কার হয়ে গেল !

রণছোড়জি জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে, খানিকটা দৌড়ে গিয়ে বসল, এখানেও এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি, মাটি শুখা। বড়ি তাজ্জব কী বাৎ।

চুনিলালবাবু বললেন, অত মেঘ গজরাল, বাজ পড়ল, অত জোর বৃষ্টি, আর এখানে কিছুই নেই ?

মেঘুদা বলল, এরকম হয়। আমি একবার কলেজ স্ট্রিটে দেখেছি, রাস্তার এক ধারে বৃষ্টি পড়ছে, অন্য ফুটপাথ একেবারে খটখটে শুকনো !

চুনিলালবাবু বললেন, সে তো বর্ষাকালে হয়। টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়ায়, হঠাৎ হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি নামে। কিন্তু এই সময় এই অঞ্চলে বৃষ্টিই পড়ে না, পরিষ্কার আকাশ ছিল, হঠাৎ শুধু এক জায়গায় মেঘ জমল, অত জোর বাজ পড়ল, এখানে এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, কেমন যেন খটকা লাগছে !

মেঘুদা বলল, আপনারা দেখছি, সব কিছুর মধ্যেই রহস্য খোঁজেন। বৃষ্টির ধরন-ধারণ বোঝা সহজ নয়।

চুনিলালবাবু বললেন, যাই বলুন, ব্যাপারটা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। এতখানি বয়েস হল, কখনও এরকম দেখিনি। এত মেঘের হাঁক-ডাক, আবার দশ মিনিটের মধ্যে সব ফর্সা! দিব্যি জ্যোৎস্না ফুটেছে।

রণছোড়জি বলল, ম্যায় ভি এইসান কভি নেহি দেখা।

মেঘুদা বলল, প্রকৃতির খেয়াল। আমাদের কি কোনও ক্ষতি হয়েছে ? যদি আমাদের কারুর মাথায় বাজ পড়ত, তা হলেও না হয় মনে

করা যেত যে কোনও অলৌকিক শক্তি আমাদের তাড়া করেছে। সে রকম তো কিছুই নয়। চলুন, বরং বাজ পড়ার জায়গাটা একবার দেখে আসি।

জিপ থেকে নেমে আবার আমরা এলুম আলবেলি ঝাপটার ধারে। পাতলা জ্যোৎস্নার জন্য অন্ধকার খানিকটা কেটে গেছে বটে, কিন্তু সব কিছুই অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। হাওয়া নেই, গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। কেমন যেন একটা বুক চাপা, থমথমে ভাব। ভয়ের কিছু নেই। তবু শরীরে একটা মৃদু শিহরন টের পাচ্ছি।

বাজ ঠিক কোথায় পড়ে, তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। টর্চের আলোয় আমরা কোনও পোড়া গাছ দেখতে পেলুম না। কোথাও কোনও চিহ্ন নেই। বারবার চোখ চলে যাচ্ছে আকাশের দিকে। তারায় তারায় সজ্জিত নীলিমা। খানিক আগে **এখানে জলদ মেঘ জমেছিল,** এখন যেন বিশ্বাসই করা যাচ্ছে না।

একটু পরে রণছোড়জি বলল, সার, আজ ঘরে ফিরে চলুন। আমার পেটে দরদ হচ্ছে।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললুম, হ্যাঁ, আজ ফেরা যাক। আমারও ভাল লাগছে না।

মেঘুদা টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখে বলল, সাড়ে দশটা প্রায় বাজে। আজ আর কেউ আসবে বলে মনে হয় না। চল তা হলে।

জিপে উঠে খানিকটা যাবার পর চুনিলালবাবু বললেন, দেখুন, রাস্তায় ধুলো উড়ছে। এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি। পাতাপাহাড়ীতে গিয়ে যদি বলি, আমরা একটু আগে বৃষ্টিতে ভিজেছি, বাজ পড়তে দেখেছি, তা হলে কেউ বিশ্বাস করবে?

মেঘুদা বলল, আপনারা এখনও বৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান তো ঘামান। আমি ভাবছি শিমুলগাছটার কথা। অতবড় গাছটা গেল কোথায়? আমরা গাছটার গোড়া খুঁজে না পেলেও নিশ্চয়ই কেউ কেটে ফেলেছে। ওই পেল্লায় গাছটা কাটাও তো সহজ কথা নয়!

আমি বললুম, ইলেকট্রিক করাত! তা দিয়ে বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়। বি বি সি-র ডকুমেন্টারিতে দেখেছি, অ্যামাজন নদীর ধারে রেইন ট্রি ফরেস্টের বিশাল বিশাল গাছ ইলেকট্রিক করাত দিয়ে খানিকক্ষণের মধ্যেই কেটে ফেলা হচ্ছে।

চুনিলালবাবু বললেন, রংমতী আজ দুটো ওই মেশিন আনিয়েছে দেখলুম।

আমি বললুম, ও বলল, আজ এনেছে। আগেও যে আনেনি, তার

কোনও প্রমাণ আছে? এক রাত্তিরের মধ্যে কেটে কেটে সাফ করে ফেলতে পারে। অত বড় একটা গাছ কাটলে কত লাভ হবে বলুন তো!

মেঘুদা আপন মনে বলল; গাছ এই একটা ব্যাপারে অসহায়। গাছের বুদ্ধি আছে, অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে, কিন্তু কেউ তাকে মারতে এলে আত্মরক্ষা করতে জানে না। পড়ে পড়ে মার খায়। একটা পিঁপড়েকেও মারতে গেলে কুটুস করে কামড়ে দেয়, কিন্তু গাছ কিছুই বলে না। এমন শান্ত, নিরীহ প্রাণী পৃথিবীতে আর নেই।

চুনিলালবাবু বললেন, আপনি বলছেন, গাছ খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। তবে চলাফেরা করতে পারে না কেন?

মেঘুদা বলল, এ প্রশ্নের কোনও মানে হয় না। মানুষ কেন পাখির মতন উড়ে বেড়ায় না, কিংবা মাছেরা কেন জলের বদলে ডাঙায় থাকে না, এই প্রশ্ন কি কেউ করে? এক এক জাতের প্রাণী এক এক রকম। গাছ এমনই প্রাণী, তার চলাফেরা করার দরকার হয় না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে তার খাওয়া-দাওয়া, সংসার চালানো, প্রেম-ভালবাসা, বংশবৃদ্ধি সবই হয়ে যায়। মানুষ যেমন পাখিদের মারে, মাছদের মারে, বাঘ-ভাল্লুক-হাতিদের মারে, সেই রকম গাছরা চলাফেরা করলেও মানুষ তাদের মারত।

আমি বললুম, কিন্তু তোমাদের এটা রিজার্ভ ফরেস্ট। ওই শিমুলগাছটা কাটার কি কোনও কথা ছিল?

মেঘুদা বলল, না।

আমি বললুম, তা হলে যে ওই গাছটা কেটেছে, তার শাস্তি হবে না?

মেঘুদা বলল, আগে কে বা কারা কেটেছে, সেটা প্রমাণ হোক! হাতেনাতে না ধরতে পারলে প্রমাণ করা খুব শক্ত। রণছোড়, কাল বনোয়ারিবাবুর কাঠগুদাম একবার দেখে আসবি। বিশ্বনাথ ওঝার চটিতে শিমুলগাছ পড়ে আছে কি না তাও দেখতে হবে।

চুনিলালবাবু বললেন, যদি কেউ গাছটা কেটে থাকে, তা হলে সে কি আর এতক্ষণ আস্ত রেখেছে! তক্তা বানিয়ে ফেলেছে।

আরও খানিকটা দূর যাবার পর আমি বললুম, মেঘুদা, এক্ষুনি একটা কথা মনে এল, এতদিন সেটা ভাবিনি। একটা গাছকে কেটে ফেললেই কি সেটা মরে যায়?

মেঘুদা বলল, না।

চুনিলালবাবু বললেন, সে কি মশাই? ডালপালা ছেঁটে দিলেও গাছ বেঁচে থাকে জানি, কিন্তু একেবারে গোড়া থেকে কেটে দিলেও গাছ মরবে না?

মেঘুদা বলল, আমরা যাকে মৃত্যু বলে মনে করি, গাছের মৃত্যু ঠিক সে রকম নয়। গাছ একটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের প্রাণী। এখনও গাছের জীবনযাপন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানি না। যেটুকু জানছি, তাতেই অবাক হচ্ছি। বহুকাল আগে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, গাছের প্রাণ আছে বটে কিন্তু আর কোনও অনুভূতি নেই। তারপর সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি লোকে সেই ধারণাটাই আঁকড়ে বসে ছিল। এই মাত্র শ' দুয়েক বছর ধরে নতুন করে গবেষণা শুরু হওয়ায় গাছেদের এক একটা স্বভাবের পরিচয় পেয়ে বিজ্ঞানীরা চমকে চমকে উঠছে। ডারুইন বলেছেন, মানুষের মতন গাছেদেরও অনেক রকম অনুভূতি তো আছেই, এমনকি গাছ প্রয়োজনে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াতে-চড়াতেও পারে। সেটা সে তার প্রয়োজনে করে আর খুব আস্তে আস্তে, তাই মানুষের চোখে পড়ে না। একটু ধৈর্য ধরে লক্ষ করলেই কিন্তু দেখা যায়।

চুনিলালবাবু বললেন, লজ্জাবতী লতাকে একটু ছুঁলেই গুটিয়ে যায়।

মেঘুদা বলল, হ্যাঁ, ওরকম কিছু লতা আছে, যা চটপট নড়াচড়া করে। তা ছাড়াও প্রমাণ করা যায় অনেক লতানে গাছ, যারা নিজেরা উঠে দাঁড়াতে পারে না, অন্য কিছুকে আঁকড়ে ধরে ওঠে, তাদের টেন্ড্রিল বলে একটা জিনিস থাকে। টেন্ড্রিল-এর বাংলা আমি জানি না, ওই যে কর্ক স্ক্রুর মতন পাকানো পাকানো একটা জিনিস, ওইটুকু জিনিসের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। মনে করুন, একটা লতা থেকে খানিকটা দূরে একটা লাঠি পুঁতে দেওয়া হল। টেন্ড্রিলটা ঠিক আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে লাঠিটাকে জড়িয়ে ধরবে। এটা নিশ্চয়ই দেখেছেন অনেকবার। এবার মনে করুন, লাঠিটা ডান দিকে ছিল, সেটাকে সরিয়ে এনে বাঁ দিকে পুঁতলেন। টেন্ড্রিলটা আবার ঠিক বাঁ দিকে গিয়ে লাঠিটাকে ধরবে।

চুনিলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, এটা বোধ হয় ঠিক।

মেঘুদা বলল, জন্ম থেকেই প্রত্যেক গাছের দু'রকম গতি শুরু হয়।

গ্যেটে নামে একজন বিখ্যাত জার্মান কবি ছিলেন জানেন তো! তাঁর বোটানিতেও ঝোঁক ছিল। সারা দিন ধরে ঠায় বসে তিনি ফুলগাছ, লতা দেখতেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, একটা বীজ মাটিতে ফেলার পর গাছের গতি চলে বিপরীত দিকে। শিকড় যায় মাটির মধ্যে, যেন মাধ্যাকর্ষণ তাকে টানছে। আর একটা অংশ উঠতে থাকে ওপরের দিকে, যেন মাধ্যাকর্ষণকে সে অগ্রাহ্য করছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল একটা অন্য কথা। গাছ থেকে একটা আপেল খসে পড়তে দেখে নিউটন সাহেব আবিষ্কার করেছিলেন, গ্র্যাভিটি বা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম। পৃথিবী সব কিছুকেই নিজের দিকে টানছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন অত বড় বৈজ্ঞানিক

নিউটন সাহেবের মাথাতেও আসেনি, আপেলটা গাছের ডালে গেল কী করে?

চুনিলালবাবু, বুঝতে না পেরে বললেন, আপেল, মানে, অনেক গাছেই তো এরকম ফল ফলে। লম্বা লম্বা নারকোল গাছে নারকোল হয়, তার ভেতরে জল থাকে, শাঁস থাকে।

মেঘুদা বলল, হ্যাঁ। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন কি, অত উঁচুতে নারকোলগুলো ফলে কী করে?

চুনিলালবাবু বললেন, গাছের শেকড় দিয়ে মাটি থেকে রস টানে। সেই রস গাছের গুঁড়ির ভেতর দিয়ে ওপরে ওঠে। ডালে ডালে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই রস থেকেই ফুল ফোটে, ফুল থেকে ফল হয়।

মেঘুদা বলল, বাঃ, এসব তো ঠিকই বলছেন। তবু একটা ধাঁধা রয়ে গেল যে! শেকড়গুলো যে রস টানছে, সেটা ওপরে উঠছে কী করে? কোনও জিনিস কি মাটি ছেড়ে আপনা আপনি ওপরে উঠতে পারে? সেটা মাধ্যাকর্ষণের বিরোধী নয়? আমরা মাটি থেকে জল তুলি পাম্প করে। যেমন টিউবওয়েল। কুয়োর মধ্যে টুলু পাম্প বসিয়ে পাইপ দিয়ে বাড়ির ছাদে জল তোলা যায়। এমনি এমনি তোলা যায় না, একটা পাম্পের সাহায্য লাগে। গাছপালার সরু সরু শেকড়ের মধ্যে কি সে রকম পাম্প আছে?

চুনিলালবাবু অবোধের মতন মাথা নেড়ে বললেন, সে তো আমি জানি না।

মেঘুদা বলল, না পাম্প নেই। তবু শেকড় থেকে রস গাছের ডগা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেই রসে ফুল ফোটে, ফল ফলে। মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে। একে বলে লেভিটি। গাছপালারাই শুধু এরকম পারে। মানুষ কিংবা অধিকাংশ প্রাণীরই হৃৎপিণ্ড নামে একটা পাম্প আছে।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি আবার বললুম, মেঘুদা, তুমি আমার আগের প্রশ্নটার ঠিক উত্তর দিলে না। একটা গাছের গোড়া থেকে কেটে ফেললেও সে মরে না!

মেঘুদা বলল, বললুম যে, আমাদের মৃত্যু আর গাছেদের মৃত্যু ঠিক এক রকম নয়। আমাদের মৃত্যু মানে হৃৎপিণ্ড থেমে যাওয়া। গাছেদের তো হৃৎপিণ্ড বলে কিছু নেই। ওদের ঠিক কী ভাবে মৃত্যু হয়, কতদিনে হয়, তা নিয়ে আরও অনেক গবেষণা বাকি আছে। সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা কী বুঝি, যেই আমাদের হৃৎপিণ্ডটা থেমে যায়, তার পরেই আমাদের শরীরে পচন শুরু হয়। দারুণ অসুস্থ অবস্থায়, এমনকি কোমার

মধ্যে মাসের পর মাস বিছানায় পড়ে থাকলেও শরীর পচে না। তখনও হৃৎপিণ্ডটা চলে। থামা মানেই মৃত্যু। গাছেদের বেলায় কী হয়!

চুনিলালবাবু বললেন, গাছ থেকে ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে রেখে দিলে অনেক দিন থাকে। গাছ থেকে কলম করা যায়। কলমের ডাল পুঁতে দিলে আবার পুরো একটা গাছ হয়ে যায়।

মেঘুদা বলল, অনেক গাছ কলমও করতে হয় না। সজনে গাছ চেনেন, যাতে সজনে ডাঁটা হয়? সেই সজনে গাছের একটা ডাল কেটে এনে আর এক জায়গায় পুঁতে দিলে আপনিই একটা বড় সজনে গাছ হয়ে যাবে। আমাদের হাত কিংবা পা কেটে নিয়ে কোথাও রেখে দিলে তার থেকে আবার একটা গোটা মানুষ হতে পারে?

রণছোড়জি একটা ভয়ের শব্দ করল।

মেঘুদা বলল, এ তো গেল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা। গোটা গাছটাকে কেটে ফেললেও কিন্তু পচতে শুরু করে না। বড় গাছের গুঁড়ি চিরে তক্তা বানানো হয়, তা দিয়ে চেয়ার-টেবিল-খাট কতরকম ফার্নিচার হয়, সেই কাঠ বছরের পর বছর থেকে যায়, পচে না তো! তা হলে সেগুলো কি তখনও বেঁচে থাকে? আমি এর উত্তর জানি না।

চুনিলালবাবু বললেন, আচ্ছা মেঘুবাবু, আর একটা কথা বলুন তো? পাথরেরও কি প্রাণ আছে?

মেঘুদা বললেন, আপনি জগদীশ বসুর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন? তিনি বলেছিলেন, সজীব আর জড় পদার্থের সীমারেখাটা খুব স্পষ্ট নয়। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, বেশি বেশি ব্যবহারের ফলে অনেক ধাতুও ক্লান্ত হয়ে পড়ে প্রাণীদের মতন। যাকে বলে মেটাল ফেটিগ। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে কিংবা গরম জলে স্নান করিয়ে সেই ক্লান্ত ধাতুকে আবার চাঙ্গা করেও তোলা যায়। এটা কিসের লক্ষণ? নানা রকম ধাতু মিশিয়েই তো পাথর হয়।

রণছোড়জি এবার স্বস্তির সঙ্গে বলল, বাংলোর বাত্তি দেখা যাচ্ছে। এসে গেছি।

চুনিলালবাবু বললেন, আমায় তা হলে এখানেই নামিয়ে দিন, আমি বাড়ি যাই।

মেঘুদা বলল, বাড়ি গিয়ে কী করবেন, সেখানে তো আপনার জন্য কেউ অপেক্ষা করে বসে নেই! এখানেই থেকে যান।

চুনিলালবাবু ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মেঘুদা মাঝে মাঝে কাঠখোট্টার মতন কথা বলে। চুনিলালবাবুকে তাঁর বউ-ছেলের কথা মনে করিয়ে দেবার কোনও মানে হয়? আমি

তাড়াতাড়ি বললুম, আমাদের জন্যই বা কে বসে আছে বাংলোতে? সবাই মিলে এক সঙ্গে থাকলে ভাল লাগবে।

মেঘুদা বলল, আমি তো সেই কথাই বলছি। বাড়ি ফিরে কী করবেন, চুনিলালবাবু? এখানে সবাই মিলে আড্ডা মারা যাবে। ভূত দেখার ব্যাপারটা তো এখনও শেষ হয়নি।

চুনিলালবাবু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, আপনার এখানে দিনের পর দিন খেয়ে যাব, অন্নঋণ থেকে যাবে।

মেঘুদা বলল, এই আপনাকে নিয়ে মুশকিল। আপনি কতটুকুই বা খান, তাও আবার নিরামিষ।

চুনীলালবাবু বললেন, আপনি গাছপালা সম্বন্ধে এমন সব কথা বললেন, এখন তো মনে হয়, নিরামিষও খাওয়া উচিত নয়।

মেঘুদা হা-হা করে হেসে বলল, তা হলে কী খাবেন! বায়ুভুক হবেন? কোন দিন হয়তো প্রমাণ হয়ে যাবে, হাওয়ারও প্রাণ আছে। প্রত্যেকটা অণু-পরমাণুর মধ্যেই কিন্তু স্পন্দন আছে, জানেন তো?

রাত্তিরে কিন্তু আড্ডা আর জমল না।

খাওয়াদাওয়া শেষ করার পরই আমার হাই উঠল। কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে। অথচ জিপে ঘোরাঘুরি ছাড়া তেমন তো পরিশ্রম কিছু হয়নি। মেঘুদা আর চুনিলালবাবু গাছপালা নিয়ে আবার কথা শুরু করতেই আমি ঘুমে ঢলে ঢলে পড়তে লাগলুম।

মেঘুদা এক সময় বলল, এই নীলু, যা তুই বরং শুয়ে পড়। আমরাও আজ উঠে পড়ি।

বাংলোতে মোট চারখানা ঘর, সুতরাং আমরা প্রত্যেকেই আলাদা ঘরে শুতে পারি। মেঘুদার ঘরে আমার সুটকেসটা রয়েছে। সে ঘর থেকে আমার পাজামা আর গেঞ্জিটা আনতে গিয়ে, একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে, আমি জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা মেঘুদা, আলবেলি ঝাপটায় বৃষ্টি পড়ার পর কি তোমাদের শীত করছিল?

মেঘুদা বলল, শীত? যা গরম পড়েছে, এর মধ্যে আবার শীত কী রে! কতক্ষণই বা বৃষ্টি হল!

আমি বললুম, আমার একটু একটু কাঁপুনি লেগেছিল। তা হলে কি আমার জ্বর-টর এল?

মেঘুদা আমার কপালে হাত দিয়ে বলল, না, জ্বর তো নেই। তুই বললি বলে এখন খেয়াল হচ্ছে, আমারও যেন দু'- একবার ঝাঁকুনি লেগেছিল। কেন বল তো?

মেঘুদা ভুরু কুঁচকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে।

॥ পাঁচ ॥

সকালবেলা চুনিলালবাবু বললেন, নীলুভাই, আমি একবার শহরে যাব, তুমি আসবে নাকি আমার সঙ্গে ?

মেঘুদার বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো অভ্যেস। গতকাল অসুস্থ ছিল, অন্য দিনও সাড়ে আটটা-ন'টার আগে জাগে না। আমার এখানেও ভোর হতে না-হতে ঘুম ভেঙে যায়। আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় নানারকম পাখির ডাক। শহরের লোকেরা খাঁচায় টিয়াপাখি পোষে, আর এখানে বাংলোর ঠিক সামনেই একটা জামরুল গাছে ঝাঁক ঝাঁক টিয়া এসে বসে। দোয়েল পাখিরা শিস দেয়, বুলবুলি পাখিরা কোনও গাছের সরু সরু ডালে বসে দোল খায়। আশ্চর্যের ব্যাপার, এখানে একটাও কাক নেই।

পাখির ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে চিখরিয়ার গলাবাজি। ভোর থেকেই সে কাকে কাকে যেন ধমকাতে শুরু করে। আমার ধারণা, সে একা একা কথা বলে। মাঝে মাঝে কার দিকে যেন সে চোটপাট করে তেড়ে যায়। এর মধ্যে কি ঘুমোনো সম্ভব ? মেঘুদার নিশ্চয়ই এসব অভ্যেস হয়ে গেছে।

চুনিলালবাবুর সঙ্গে ঘুরে এলে মন্দ হয় না। উনি সাইকেলে যাবেন, আমি রণছোড়জির সাইকেলটা ধার নিলুম।

এই বাংলোটা জঙ্গলের ধার ঘেঁষে। নতুন গজিয়ে ওঠা শহরটা এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে। ঝিন্দোয়া নদীটা সেখান থেকে চওড়া হতে শুরু করেছে। কাছাকাছি কোনও রেল স্টেশান নেই, ট্রেন ধরতে গেলে তেইশ মাইল দূরে তিতলিগঞ্জ যেতে হয়।

সকালের দিকে হাওয়ায় আঁচ থাকে না। সাড়ে নটা-দশটা থেকে গরম শুরু হয়। চুনিলালবাবুর সঙ্গে পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে টুকটাক কথা হতে লাগল। ওঁর কোনও ভবিষ্যৎ চিন্তা নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, কারুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ-অভিমান নেই, হিংসে নেই, এইভাবেই জীবনটা কাটিয়ে যাবেন। অনিশ্চিত উপার্জন, বেশি বৃদ্ধ হয়ে পড়লে কে দেখাশুনো করবে সে কথাও ভাবেন না। সকালবেলাতেই রেডিও-র খবর শুনেছেন যে ফ্রান্স আবার ভারত মহাসাগরে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, তাই নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। আমাকে বললেন, এর ফলে অস্ট্রেলিয়ার লোকদের যদি বিষের ধোঁয়া লাগে, তা হলে কী হবে বলুন তো ! সেই লোকগুলো তো কোনও দোষ করেনি ! ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে জাপানে দুটো অ্যাটম বোমা পড়েছিল, তাই

জাপানও ফরাসি সরকারের এই ব্যবহারে খুব চটে যাচ্ছে। আচ্ছা নীলুভাই, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের তো অনেক ক্ষমতা, তিনি ফরাসি দেশের প্রেসিডেন্টকে ধমকে দিতে পারেন না ? কিংবা মিষ্টি কথাতেও তো বলতে পারেন, তুমি ভাই ওইসব অ্যাটম বোমা-টোমা আর ফাটিও না। কী দরকার, এসো আমরা সবাই বেশ মিলেমিশে ভাব করে থাকি !

শহরটার কোনও পরিকল্পনা নেই, একটা টানা বড় রাস্তা, আর সব আঁকাবাঁকা গলি। যেখানে-সেখানে বাড়ি গজিয়ে উঠেছে। খাপরার চালের নড়বড়ে কুঁড়েঘরও যেমন আছে, তেমনই আছে দোতলা-তিনতলা পাকা বাড়ি। হঠাৎ বড়লোকদের সেইসব বাড়ির ছাদে ডিশ অ্যান্টেনা বসানো।

চুনিলালবাবুর বাড়িটি একটি পুকুরের ধারে। টালির চাল দেওয়া একটাই ঘর, লাগোয়া রান্নার জায়গা, তারপর উঠোনের ওধারে বাথরুম। তালা খুলে সেই ঘরে ঢোকার পর প্রথমেই চোখে পড়ে তার শ্রীহীনতা। ঘরটি বেশ বড়, কিন্তু তাতে শুধু একটা খাট ছাড়া আর কিছুই নেই। কোনও বাক্স-তোরঙ্গ-আলনা কিচ্ছু না। অথচ এক সময় ওঁর স্ত্রীও তো ছেলেকে নিয়ে এই ঘরেই থাকত। স্ত্রী কি অন্য সব কিছু নিয়ে চলে গেছে ? না, চুনিলালবাবুই ওদের সব স্মৃতিচিহ্ন ফেলে দিয়েছেন ?

একটাই শুধু চিহ্ন আছে। ওঁর বিছানায়, শিয়রের কাছে একটা প্লাস্টিকের তৈরি রেলগাড়ি। নিশ্চয়ই ওঁর ছেলের খেলনা ছিল, খানিকটা তুবড়েও গেছে, সেইটা উনি রোজ মাথার কাছে নিয়ে শুয়ে থাকেন ?

চুনিলালবাবু স্ত্রী-পুত্রের কথা উল্লেখ মাত্র করলেন না। হেসে বললেন, তালা দিয়ে যাই কেন বুঝলে ? যদি আর কেউ এসে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ে ! আমি অন্য কারুর সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পারি না। চা খাবে ? দুধ ছাড়া চা বানাতে পারি। বাড়িতে অতিথি এলে কিছু তো খাওয়াতে হয়।

রান্নাঘরেও বাসনপত্র দু-চারটি মাত্র। কিন্তু বেশ তকতকে পরিষ্কার। কালিঝুলি জমে নেই।

উনুন ধরাতে ধরাতে বললেন, কাল থেকে কয়লা আর ঘুঁটে কিনে রাখব। কাঠের আগুন জ্বালব না। গাছের ফল না খেয়ে উপায় নেই, কিন্তু কোনও গাছ কাটার জন্য দায়ী হব না।

উঠোনে বেরিয়ে এসে বললেন, দেখো, কাল রাতে এদিকেও একফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। গাছগুলোর পাতায় ধুলো জমে আছে।

উঠোনের এক পাশে কতকগুলো ঢ্যাঁড়শ গাছ, একটা মাচার ওপর উচ্ছে আর ঝিঙে, তার পাশে একটা মাঝারি আকারের পেয়ারা গাছ।

চুনিলালবাবু পরম যত্নে সেইসব গাছের পাতায় হাত বুলোতে লাগলেন। যেন গাছপালা সম্পর্কে তিনি একটা নতুন দৃষ্টি পেয়েছেন।

একসময় বললেন, দেখো দেখো, ঝিঙেফুলগুলো ঠিক যেন আমাদের দিকে চেয়ে আছে। তাই না?

আমি চুপ করে রইলুম।

চুনিলালবাবু বললেন, দু'দিন দেখতে পায়নি, আজ আমাদের দেখে নিশ্চয়ই কিছু ভাবছে! ফুলগুলো একবার নড়ে উঠল, দেখলেন?

ঝিঙেগাছের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে আমার কোনও জ্ঞান নেই, খুব একটা কৌতূহলও নেই। আমি ভাবছিলুম, এরকম একটা ছোট্ট জায়গায় এই বাড়িতে চুনিলালবাবু একা একা সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিছুটা লেখাপড়া জানেন, পৃথিবী সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে, তবু নিজের জন্য তাঁর আর কিছুই চাইবার নেই। একবারও ওঁর বালেশ্বরে গিয়ে ছেলে-বউয়ের খোঁজ নিতে ইচ্ছে করে না?

চুনিলালবাবু যে-রকম মানুষ, কিছুতেই স্ত্রীর ওপর জোর করে স্বামীর অধিকার দাবি করবেন না। মামলা-মোকদ্দমা করার তো প্রশ্নই ওঠে না। স্ত্রী যে ছেড়ে চলে গেল, সেজন্য কি অভিমানও নেই? শুধু ছেলের ভাঙা খেলনাটা ফেলে দিতে পারেননি।

চা খেতে খেতে চুনিলালবাবু বললেন, ভূষণ চৌধারির টাইফয়েড হয়েছে। একবার দেখে আসা উচিত। আমাকে উনি খাতির করেন। তুমিও চল।

আমি বললুম, অসুস্থ লোকের কাছে ভিড় বাড়ানো কি ঠিক হবে?

চুনিলালবাবু বললেন, এখানকার লোকেরা খুশি হয়। কারুর অসুখ করল, আর চেনাজানা লোকেরা দেখা করতে গেল না, সেটা সবাই মনে রাখে। যে যে যায় না, তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখে না। বিয়ে-শাদিতে তবু না যেতে পারে, কিন্তু অসুখ হলে যেতেই হবে।

সবগুলো গাছের গোড়ায় জল ঢেলে দিলেন চুনিলালবাবু। তারপর বেরিয়ে পড়া গেল।

খানিক পরেই রাস্তার ধারে বাজার। কয়েকটা বড় বড় দোকান। ওষুধ, স্টেশনারি জিনিসপত্র। একটা দোকানের নাম রঙ্গমতী স্টোরস। সেটা দেখিয়ে চুনিলালবাবু বললেন, এটা ভূষণবাবুর, ওঁর আরও ব্যবসা আছে।

দোকানটি জিনিসপত্রে ঠাসা। কৌটোর দুধ, নানারকম বিস্কুট, মস্ত মস্ত আলুভাজার প্যাকেট—এসব দেখা যাচ্ছে শো-কেসে। এই ছোট্ট জায়গাতেও এসব কেনার লোক আছে নিশ্চয়ই।

ভূষণ চৌধারির বাড়ি ফাঁকা জায়গায়। গেট পেরুবার পর অনেকটা খোলা জমি। তারপর একটা দোতলা বাড়ি। এতখানি জায়গা পড়ে আছে, কিন্তু বাগানটাগান করার ধার ধারেনি। আগেই শুনেছি ভূষণ চৌধারি এক পুরুষের বড়লোক, নিজের উদ্যোগে সবকিছু করেছে, অল্প বয়েসে সে এক ঠিকাদারের সামান্য কর্মচারি ছিল। উন্নতি করতে করতে একসময় সে দু'বছরের জন্য জেলও খেটে এসেছে। এখানকার বড়লোকরা দু-একটা খুন-টুন করলে তা নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামায় না, তাতে তাদের ইজ্জৎ বাড়ে।

বাংলা বিহারের সীমান্ত এলাকা বলে এখানে প্রায় সবাই দুটো ভাষাই ভাল জানে। হয়তো দু'জন লোক নিজেদের মধ্যে হিন্দিতে কথা বলছে, তৃতীয় এক ব্যক্তিকে দেখে পরিষ্কার বাংলা বলতে শুরু করে। রংমতীও দরজার ধারে দাঁড়িয়ে একটা বেঁটে লোককে ঠেট হিন্দিতে খুব ধমকাচ্ছিল, আমাদের দেখে মুখে হাসি এনে বলল, নমস্কার মাস্টারবাবু। কাল রাতে আমি তো ছিলাম ক্যাম্পে। কোথায় ভূত? সাথে পিস্তল ছিল, কেউ এলে খোপরি উড়িয়ে দিতাম।

চুনিলালবাবু নিরীহভাবে বললেন, তুমি পিস্তল চালাতেও জানো নাকি?

রংমতী বলল, আমি সব জানি। ভোররাতে কী হল শুনুন। একপাল বান্দর এসেছিল, তাতেই কামিনগুলো ভয়ে অস্থির। যত্তোসব ডরপুক নিয়ে কারবার!

চুনিলালবাবু সঙ্গে সঙ্গে কামিনদের পক্ষ সমর্থন করে বললেন, একসঙ্গে একপাল বান্দর দেখলে আমারও ডর লাগে। ওদের দোষ কী! তার ওপর ওরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে!

রংমতী বলল, কিছু ঘটেনি। সব বাকোয়াস! টাকা বাড়াবার ধান্ধা, বুঝলেন? ভূতের জন্য আমি রোজ বাড়িয়ে দিব? ওসব দিল্লাগি আমার সাথে চলবে না। হারামির বাচ্চাগুলোকে ভাগিয়ে দিয়ে অন্য কামিন আনব।

এই আলোচনায় আর বেশি দূর না এগিয়ে চুনিলালবাবু বললেন, তোমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছি। উনি তৈয়ার হয়েছেন তো? আমার সঙ্গে এসেছে, এর নাম নীললোহিত।

রংমতী আমার দিকে একবার তির্যক চোখে তাকাল, কোনও পাত্তা দিল না। বলল, বসুন, ভিতরে খবর পাঠাচ্ছি।

বসবার ঘরে চেয়ার-টেবিল কিছু নেই, কয়েকটা চৌকির ওপর সাদা ফরাশ পাতা। দেয়ালে সস্তা ফ্রেমে বাঁধানো নানা ঠাকুর-দেবতার ছবি।

তার মধ্যে গান্ধীজি। উনি এখানে কী করছেন ? গান্ধীজির দেবতা বনে যাবারও আশা নেই, কেউ পুজো করবে না, আজকাল কেউ নামও উচ্চারণ করে না।

চুনিলালবাবু ফিসফিস করে বললেন, এই যে রংমতীকে দেখছ, এর সঙ্গে তোমার মেঘুদার বিয়ের কথা হয়েছিল।

আমি চমকে উঠে বললুম, অ্যাঁ ? বিয়ের কথা হয়েছিল মানে, মেঘুদা চেয়েছিল, ওদের প্রেম হয়েছিল ?

চুনিলালবাবু বললেন, আরে না, না। ওসব প্রেম-ভালবাসা এখানে চলে না। তোমার মেঘুদা ব্যাচেলর, তাকে দেখে ভূষণবাবুর পছন্দ হয়েছিল। রংমতীরও আপত্তি ছিল না। ভূষণবাবু চেয়েছিলেন তোমার মেঘুদাকে ঘরজামাই করবেন। এই পাশে বাড়ি বানিয়ে দেবেন। রেঞ্জারের চাকরি ছেড়ে দিলেও আপত্তি নেই, নিজের কারবারে বসাবেন। কিন্তু মেঘুবাবু রাজি হলেন না।

আমি বললুম, খুব জোর বেঁচে গেছে। এই মেয়েকে বিয়ে করলে মেঘুদা সামলাতে পারত ? এ তো হান্টারওয়ালি ! দেখলেই ভয় করে।

চুনিলালবাবু বললেন, চুপ, আস্তে। ভূষণ চৌধারি মানী লোক, কারুর মুখে না কিংবা পারব না শোনার অভ্যেস নেই। তিনি খুব রেগে গিয়ে বলেছিলেন, ও বাংগালিটা কী চায় ? পাঁচ লাখ, দশ লাখ, বিশ লাখ ! ওরকম একডজন ফরেস্ট রেঞ্জারকে আমি নোকর রাখতে পারি। ও কেন বিয়ে করবে না ? রংমতীরও খুব মনে লাগল। তার মতন মেয়েকে একটা সামান্য সরকারি কর্মচারি রিফিউজ করেছে। সে আর অন্য কোথাও বিয়েই করতে চায় না।

আমি বললুম, কী মুশকিল, একটা মানুষের বিয়ে করার স্বাধীনতা থাকবে না ?

চুনিলালবাবু বললেন, একবার শুনেছিলাম কী, ভূষণবাবু গুণ্ডা লাগিয়ে জোর করে মেঘুবাবুকে ধরে আনাবেন। একবার বিয়ে হয়ে গেলে তো আর উনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

আমি বললুম, ওরে বাবা, জোর করে মেয়ে তুলে নিয়ে যাবার কথা শুনেছি। জোর করে পুরুষও তুলে নেওয়া যায় ?

চুনিলালবাবু বললেন, টাকার জোর থাকলে সবকিছুই সম্ভব। মেঘুবাবুও তেজী লোক, সবার সামনেই বলতেন, ভূষণ চৌধারির বাপের সাধ্য নেই আমার গায়ে হাত ছোঁয়ায়, আমিও ঘোষাল বংশের ছেলে। আমার ঠাকুর্দা ব্রিটিশ আমলে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করেছে। আমরা ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলেছি, চুপেচাপে থাকুন, না হলে খুনোখুনির

ব্যাপার হয়ে যেতে পারে। কী দরকার। থানার দারোগাও মাঝখানে দাঁড়াল। এখন দু'পক্ষই একটু শান্ত আছে। কিন্তু রংমতী অন্য কোথাও বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। সে মেঘুবাবুর ওপর খুব তেতে আছে।

আমি বললুম, বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এত কাণ্ড ! কখনও শুনিনি !

একজন লোক এসে আমাদের দু' গেলাস সরবৎ দিয়ে গেল।

আজকাল প্রায় সব বাড়িতেই চা কিংবা বোতলের ঠাণ্ডা পানীয় দেয়। বাড়ির তৈরি সরবতের ব্যাপারটা তো উঠেই গেছে। সাধারণ কাচের গেলাসের চেয়ে দ্বিগুণ আকার, দু'হাতে ধরতে হয়, ভেতরের তরল পদার্থটি হলদেটে সাদা রঙের। গেলাসটির দিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আমি মেঘুদার ভাইয়ের মতন, আমার ওপরেও নিশ্চিত এদের রাগ থাকবে, বিষ-টিশ মিশিয়ে দেয়নি তো !

চুনিলালবাবু বললেন, আরে না, না, কী বলছ। বাড়িতে অতিথি এলে এরা খুব সম্মান করে।

আমি বললুম, সিদ্ধিটিদ্ধি থাকলেও আমি খেতে পারব না। ওসব আমার সহ্য হয় না।

চুনিলালবাবু নিজে এক চুমুক দিয়ে বললেন, মালাই। নেশার জিনিস আমিও খাই না।

সরবতের স্বাদ অতীব চমৎকার। অত বড় এক গেলাস শেষ করার পরেও মনে হল, আর একটু থাকলে মন্দ হত না।

দেয়ালের ছবি থেকে গান্ধীজি আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। মিটিমিটি হাসছেন। আজ এখানে কিছু ঘটবে নাকি ? সরবতের ফাঁড়াটা তো পার করা গেল।

একটু বাদে ডাক এল ওপরে যাবার। একজন লোক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। বাড়িটা আসলে বেশ বড়। বারান্দার পর বারান্দা পার হয়ে যাচ্ছি, মাঝে মাঝে ছোট ছোট সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা, ছোট-বড় নানা রকমের দরজা। তারপর একটা ছোট ঘর পেরিয়ে বড় ঘর, তার দু'দিকের দেয়ালের গায়ে অন্তত সাত-আটটা স্টিলের আলমারি, মাঝখানে বিশাল পালঙ্কে শুয়ে আছে এক প্রৌঢ়, বেশ রোগা আর লম্বা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায় বেশ অসুস্থ। এই সেই মহা প্রতাপান্বিত ভূষণ চৌধারি !

পালঙ্কের একপাশে দুটি চেয়ারে বসে আছে দুই ব্যক্তি, একজনকে চিনলুম থানার দারোগা ইয়াহিয়া খান, আর একজন সম্ভবত ডাক্তার।

চুনিলালবাবু বললেন, নমস্তে চৌধারিবাবু, আজ কেমন আছেন ?

ভূষণ চৌধারি সামান্য মাথা উঁচু করে বলল, নমস্কার সাউজি, আপনি আবার কেন কষ্ট করে এলেন।

চুনিলালবাবু বললেন, আসব না, আপনার মতন কর্মী পুরুষ বিছানায় শুয়ে আছেন, এর আগে কখনও আপনার অসুখের কথা শুনিনি, আমরা সবাই চিন্তিত—

ভূষণ চৌধারি বলল, আপনাদের শুভ কামনাই তো আমার সম্বল। বিষ্ণুজির মন্দিরে এই গুরুবারে পূজা দিচ্ছি, নিশ্চয়ই সেখানে আসবেন।

একটুক্ষণ এইরকম ভদ্রতার বিনিময় চলল। ঘরে আর চেয়ার নেই, আনতে বলাও হল না, অর্থাৎ আমরা বসার যোগ্য নই। আমাদের তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হবে।

কিন্তু চুনিলালবাবু বেশি কথা বলতে ভালবাসেন। খুঁটিনাটি খবর নিতে লাগলেন, তাতে জানা গেল যে ভূষণবাবুর জ্বর একশো দুইয়ের নীচে নামছে না, কখনও একশো সাড়ে চার পর্যন্ত ওঠে, কিছু খেতে গেলে বমি হয়ে যায় ইত্যাদি। অবস্থা বেশ খারাপ। ডাক্তার বারবার ওষুধ বদলাচ্ছেন।

কথার ফাঁকে চুনিলালবাবু একবার আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলেন। ভূষণ চৌধারি আমাকে কখনও দেখেনি, তবু শুকনো গলায় বলল, জানি। ফরেস্ট রেঞ্জারের ভাই।

দারোগা সাহেব আমার দিকেই তাকিয়ে বললেন, জঙ্গলের ভূত ধরা পড়ে গেছে জানেন তো ?

চুনিলালবাবু আর আমি দু'জনেই চমকে উঠলাম।

দারোগা সাহেব চওড়াভাবে হেসে বললেন, ওই কামিনটা এক ব্যাটার কাছ থেকে আশি টাকা ধার করেছিল। আর শোধ দেয়নি। একদিন বাজারে অনেক লোকের সামনে বলেছিল, আমি তোর টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি, দু'বার চাইছিস কেন ? তারপর লেগে গেল ঝটাপটি। যে টাকা ধার দিয়েছিল, তার নাম কাদের শেখ, দুবলা-পাতলা লোক, সে মারামারিতে পারল না। এটা দু' হপ্তা আগের কথা। তারপর ওই কাদের শেখ শোধ নেবার জন্য ক্যাম্পে গিয়ে ভূত সেজে কামিনটার গলা টিপে ধরেছিল। ব্যাটাকে থানায় নিয়ে গিয়ে দু'চার ঘা দিতেই সব কথা স্বীকার করেছে। গাছ কাটায় আর কোনও গোলমাল হবে না।

গল্পটা এতই সরল যে আমার ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। পুলিশরা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে ওস্তাদ। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে যদি মারতে শুরু করে আর জিজ্ঞেস করে, বল, তুই সেই ভূত ছিলি কিনা, কয়েক ঘা খাবার পরেই আমিও স্বীকার করে নেব, হ্যাঁ, আমিই সেই

ভূত!

ওরা আবার স্থানীয় অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগল, আমি দাঁড়িয়েই রইলুম। ঘরটা জিনিসপত্রে একেবারে ঠাসা। শোবার ঘরে এতগুলো লোহার আলমারি কেন ? ওইগুলোতে টাকা-কড়ি, সোনাদানা ভর্তি করা আছে, ভূষণ চৌধারি শুয়ে শুয়ে রোজ দেখে ? এই ঘরখানার চেয়ে চুনিলালবাবুর ঘরখানার কত তফাত ! কে বেশি সুখী ?

আমাদের বিদায় করে দেবার জন্য ভূষণ চৌধারি একসময় বলল, আচ্ছা সাউজি, নমস্কার। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে আমার কথা আছে।

চুনিলালবাবু সে ইঙ্গিত গ্রহণ না করে ভূষণের শিয়রের কাছে আরও এগিয়ে গেলেন। তারপর ব্যাকুলভাবে বললেন, চৌধারিবাবু, একটা কথা বলব, শুধু ওষুধ খেয়ে আপনার এ রোগ সারবে না। আপনি জঙ্গলের গাছ কাটা বন্ধ করে দিন। দেখবেন, তাতেই আপনার জ্বর ছেড়ে যাবে।

ঘরের সবাই সচকিত হয়ে উঠল। ভূষণ ভুরু কুঁচকে বলল, গাছ কাটা বন্ধ করব ? তার সঙ্গে আমার জ্বরের কী সম্পর্ক ?

চুনিলালবাবু বললেন, গাছপালা মানুষের বন্ধু। গাছের জন্য আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারি। গাছকে কষ্ট দিলে মানুষের ক্ষতি হয়। আবার গাছকে ভালবাসলে মানুষের রোগ সেরে যায়।

ভূষণ চৌধারি এরকম অদ্ভুত কথা কোনওদিন শোনেনি। সে অন্যদের দিকে তাকাল। কেউ কোনও মন্তব্য করল না দেখে বিরক্তভাবে বলল, সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছি, বে-আইনি কিছু করছি না। এই কারবার আমি বন্ধ করব কেন ?

চুনিলালবাবু বললেন, আপনার তো আরও কত কারবার আছে। তিনখানা দোকান, চালের আড়ত, ইট ভাঁটা, শুধু এই গাছ কাটার কারবারটা বন্ধ করে দিলে কোনও ক্ষতি হবে না। বরং মানুষের উপকার হবে। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

ভূষণ বলল, আমি এই কারবার ছেড়ে দিলে অন্য কেউ ইজারা নেবে। লছমীপ্রসাদ হারামখোরটা তো মুখিয়ে আছে। আমি কারবারটা তার হাতে তুলে দেব ?

চুনিলালবাবু বললেন, না, সেও নিতে পারবে না। আমরা সরকারের কাছে দরখাস্ত পাঠাব। জঙ্গলের গাছ কেউ কাটতে পারবে না। জঙ্গল সাফ হয়ে গেলে আমাদের বালবাচ্চারা কী করে নিঃশ্বাস ফেলবে !

ভূষণ এবার গম্ভীরভাবে বলল, দেখুন সাউজি আপনি এসব কথা কেন বলছেন আমি বুঝছি না। আপনি ভাল মানুষ, অন্য কেউ হলে মনে করতাম কী যে লছমীপ্রসাদ তাকে টাকা খাইয়েছে। এই গাছকাটার

ইজারা নিয়ে আমি প্রথম ব্যবসা শুরু করেছি। এই কারবার আমার লক্ষ্মী। এ কারবার আমি কোনওদিন ছাড়ব না।

চুনিলালবাবু কাতরভাবে বললেন, অনেক দিন ধরে এই কারবার করছেন, তার মানে কত শত শত গাছকে মেরে ফেলেছেন! চৌধারিবাবু, সব গাছেরই প্রাণ আছে জানেন তো! তারা কোনও দোষ করেনি, তবু তাদের কেটে ফেললে মানুষের পাপ হয়। সেই পাপেই আপনার পুত্রসন্তান জন্মায়নি। আপনি কত করে ছেলে চেয়েছেন—

এই রে! মেঘুদার নতুন শিষ্য হয়ে যে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন! গাছ কাটলে ছেলে হয় না, মেয়ে হয়, এ তিনি কোথায় পেলেন? গাছেরা মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি পছন্দ করে, এ যে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা!

ভূষণ চৌধারি এমন কঠোরভাবে তাকাল যেন এক্ষুনি চুনিলালবাবুকে বেঁধে চাবকাবার হুকুম দেবে।

কিন্তু চুনিলালবাবু পাগলাটে ধরনের মানুষ, এ কথা সবাই জানে। তাঁর ওপর রাগ করা যায় না। তাই ভূষণ নিজেকে দমন করে হাঁক দিয়ে বলল, আরে সুরতিয়া, মেরা নাহানেকা পানি তৈয়ার নেহি কিয়া।

দারোগা ইয়াহিয়া খান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন চুনিবাবু, এবার আমরা যাই। চৌধারিবাবুর গোসল করার সময় হয়ে গেছে—

আবার একটি লোক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। এটাকে বলা যেতে পারে তিনমহলা বাড়ি, প্রচুর আশ্রিত আত্মীয় থাকে। অনেকে কৌতূহলী হয়ে আমাদের দেখছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দারোগা সাহেব বললেন, আমিও গাছ ভালবাসি। সকালবেলা উঠে গাছপালার দিকে চেয়ে থাকি, চোখের আরাম হয়। অকারণে গাছ কাটা বড় খারাপ কাজ। জানেন তো, আগে রেল লাইনের মাঝখানে মাঝখানে যে স্লিপার, সব কাঠ দিয়ে তৈরি হত। এখন সেগুলো কংক্রিটের হচ্ছে। কত হাজার হাজার গাছ বেঁচে যাবে।

চুনিলালবাবু বললেন, বাঃ, এ তো খুব ভাল খবর। খান সাহেব, দেখুন, আমাদের পাতাপাহাড়ীর জঙ্গল কত পাতলা হয়ে যাচ্ছে। আর কিছুদিন পর জঙ্গলই থাকবে না। আপনি ভূষণ চৌধারিকে বারণ করুন না!

দারোগা বললেন, আমার বারণ শুনবে কেন? কেউ গাছ খুন করলে সেই আসামিকে ধরার ভার তো পুলিশকে দেওয়া হয়নি!

তারপর হঠাৎ জোরে হেসে উঠে বললেন, আপনি ওই কথাটা মোক্ষম বলেছেন! গাছ কাটার কারবার করে বলে ভূষণ চৌধারির ছেলে হয়নি।

হা-হা-হা, কথাটা খুব বুকে লেগেছে, বুঝলেন! সহজে ভুলতে পারবে না। দেখুন, এতে যদি কোনও কাজ হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, খান সাহেব, আপনি যাকে ধরেছেন, সে নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে, সে ভূত সেজেছিল?

দারোগা বললেন, আমি ওসব ভূতটুতের কারবারের মধ্যে নেই। কাদের শেখ অ্যারেস্ট হয়েছে অন্য পেটি কেসে। ভূষণ চৌধারি অসুস্থ হয়ে আছে, তার ওপর গাছ কাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে মনে খুব অশান্তি, তাই ভদ্রলোককে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্য ওই কথা বলে দিলাম। হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড, বুঝলেন! ভূত ধরার ভার ফরেস্ট রেঞ্জারের ওপর। উনি অনেক পড়াশুনো করেছেন, ভূত আছে কি নেই, উনি বলতে পারবেন। আপনারা জঙ্গলে তো গিয়েছিলেন রাত্তিরে, কী হল!

চুনিলালবাবু বললেন, আমার কিন্তু সত্যিই দেখেছি একজনকে। সে মানুষ না ভূত, এখনও ফয়সালা হয়নি। সে কিন্তু আপনার ওই কাদের শেখ নয়।

দারোগা বললেন, কাদের শেখ মরুক আগে, তারপর তো ভূত হবে। মোসলমান মরলে মামদো ভূত হয়, তাই না?

চুনিলালবাবু আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সেই শিমুল গাছটার কথা বলব?

দারোগা বললেন, কোন শিমুল গাছ? সেখানে আবার কী হয়েছে!

চুনিলালবাবু বললেন, আলবেলি ঝাপটার কাছে একটা বড় শিমুল গাছ ছিল, সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দারোগা বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে উদাসীনভাবে বললেন, ওরকম কত শিমুল, পলাশ, শাল, সেগুন অদৃশ্য হয়ে যাবে! ভানুমতীর খেল কাকে বলে জানেন তো, এবার দেখবেন রংমতীর খেল! রেঞ্জারসাহেবকে তার মুকাবিলা করতে হবে।

॥ ছয় ॥

ফরেস্ট গার্ড এসে খবর দিয়েছে যে, ভুসুরি টেঁড়-এর কাছে একটি হরিণ মরে পড়ে আছে। তার গায়ে একটা ক্ষতচিহ্ন আছে, খুব সম্ভবত পোচাররা সেটা মারার চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেনি।

মেঘুদা বলল, রাত্তিরে যদি বেরুতে হয়, তোরা দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে নে, আমি ইনস্পেকশান করে আসি।

আমি ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললুম, জঙ্গলে ঘোরার বদলে আমি বাংলোয় দুপুর কাটাতে মোটেই রাজি নই। ভুসুরির টেঁড়-এর দিকটা আমি এ পর্যন্ত দেখিইনি।

চুনিলালবাবুও আমার সঙ্গে একমত। শহর থেকে ফেরার পথে তিনি একটা বড় লাউ কিনে এনেছিলেন, নিজের হাতে নিরামিষ ঘন্ট রেঁধে আমাদের খাওয়াবেন বলেছিলেন, সে ভারটা চিখরিয়াকে দেওয়া হল।

ভুসুরির টেঁড়-এর দিকটায় কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড় আছে, একটা রোগা পাতলা নদীও আছে। গাড়ির রাস্তা নেই বলে এ দিকে লোকজন বিশেষ আসে না। মেঘুদা অবশ্য নদীটার ধার ঘেঁষে, বালিতে বড় বড় পাথরের চাঙড়ের ওপর দিয়েই জিপটা চালিয়ে যেতে লাগল।

নদীতে নেমে কয়েকটা লোক মাছ ধরছে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলুম, এই লোকগুলো কত দূর থেকে আসে?

মেঘুদা বলল, দূর থেকে আসবে কেন, এরা এই জঙ্গলেই থাকে।

আমার বিস্মিত চোখ দেখে মেঘুদা বলল, সব জঙ্গলেই তো মানুষ থাকে। তুই কি ভেবেছিস রিজার্ভ ফরেস্টগুলো জনমানবশূন্য!

আমি বললুম, সেইরকমই তো ধারণা ছিল।

মেঘুদা বলল, সেটা কাগজে-কলমে। গরিব মানুষরা ওসব আইন-টাইন, নিয়ম-কানুন কিছু জানেও না, মানেও না। যাদের নিজস্ব জমি-জায়গা নেই, কোনও জীবিকা নেই, তারা জঙ্গলে এসে ঘর বাঁধে। কোনওরকমে বাঁচার মতন খাদ্য জোগাড় করে। আমি এদের তাড়াতে পারি না। মানুষ তো! যদি অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা, জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে না পারি, তা হলে এখান থেকে ওদের ঘরবাড়ি ভেঙে কী করে তাড়াব!

চুনিলালবাবু বললেন, আহা, খুব ভাল করেন। ভগবানের জীব, তাদের কি মেরে তাড়ানো যায়?

আমি বললুম, তা হলে তো এরা গাছ কাটবে, জন্তু-জানোয়ার শিকার করবে। রিজার্ভ ফরেস্টের বৈশিষ্ট্য রইল কী?

মেঘুদা বলল, মাঝে মাঝে এসে ধমকাই, ভয় দেখিয়ে যাই। দেখ নীলু, মানুষকে উপোসি রেখে কি এসব সংরক্ষণ করা যায়? এরা বুনো জাম, ব্যাঙের ছাতা, এইসব কুড়িয়ে খায়। শালপাতা, শালগাছের আঠা বিক্রি করে। যবের দানা, ভুট্টার ছাতু খেয়ে কোনওরকমে বেঁচে আছে। মাছ-মাংসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। চোখের সামনে যদি একটা হরিণকে ঘুরতে দেখে, তা হলে ভুখা পেটে ওরা কি হরিণটার রূপ দেখে মুগ্ধ হবে, না বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথা ভাববে? হরিণটাকে দেখে ভাববে

একটা লোভনীয় খাদ্য। তেমনি একটা গাছ কেটে বিক্রি করলে তিরিশ-চল্লিশ টাকা পায়, ব্যবসায়ীরা সেই গাছ অনেক বেশি দামে বিক্রি করে, কিন্তু এরা তিরিশ চল্লিশ টাকার লোভ সামলাতে পারে না। আমাদের মহা মুশকিল, আমাদের গাছ বাঁচাতে হবে, বন্যপ্রাণী বাঁচিয়ে রাখতে হবে, আবার মানুষ যদি না খেয়ে মরে, তা হলে হইচই শুরু হয়ে যাবে।

চুনিলালবাবু বললেন, আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে মানুষ মরে গেলে খবর হয়, আধমরা হয়ে থাকলে তার দিকে কেউ চেয়েও দেখে না।

নদীর ধারে ধারে দু'-একটা কুঁড়েঘরও চোখে পড়ল। এ দিকে জঙ্গল বেশ পাতলা।

জঙ্গলের ভেতরকার নদীর বেশ একটা আদিম রূপ থাকে। বড় বড় পাথর ভরা রোগা নদী, হাঁটুও ডুববে না। মনে হয়, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই নদী একইভাবে বয়ে চলেছে। কোনও কল-কারখানার গাদ এর জলকে এখনও দূষিত করেনি।

ভুসুরি টেঁড়-এর কাছে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, দু'জন ফরেস্ট গার্ড সেখানে পালা করে থাকে। সেই টাওয়ার থেকে তিন-চারশো গজ দূরে পড়ে আছে হরিণটা। খুব বেশিক্ষণ আগে মরেনি, এখনও টাটকা ভাব আছে। ঘাড়ের কাছে একটা ক্ষত, সেটা পুরনো, শুকনো। মনে হয়, কিছুদিন আগে কেউ একটা টাঙ্গির কোপ মেরেছিল, তখন মরেনি, ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে গিয়ে আজ প্রাণত্যাগ করেছে। হরিণটার চোখের কোলে জলের রেখা। মনে হয়, যন্ত্রণায় খুব কেঁদেছিল।

চুনিলালবাবু গাড়িতে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। তিনি জীবহত্যা দেখবেন না।

হরিণটাকে গাড়িতে তোলা হবে শুনে তিনি আর্তকণ্ঠে বললেন, ওরে বাবা, ওর সঙ্গে যেতে হবে? না, না, মেঘুবাবু, আমি বরং হেঁটে ফিরব!

আমি বললুম, মেঘুদা, এই হরিণের মাংস তো খাওয়া যায়। হরিণের মাংস নাকি একটু পচলেও দোষ হয় না। এই জঙ্গলের লোকগুলো মাংস খেতে পায় না বললে, ওদের দিয়ে দাও না। এটাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে কী হবে!

মেঘুদা বলল, পাগল নাকি! প্রথম একবার ওইরকম করতে গিয়ে ডি এফ ও-র কাছে বকুনি খেয়েছি। মাংসটা ওদের মধ্যে বিলিয়ে দিলে ওরা মজা পেয়ে যাবে। আবার একটা হরিণ মেরে ফেলে রাখবে। জানবে যে, মাংসটা তো ওরাই পাবে! এই হরিণটাকে নিয়ে গিয়ে শুধু চামড়াটা ছাড়িয়ে বাকি সব ফেলে নষ্ট করতে হবে। রিপোর্ট লিখতে হবে।

চুনিলালবাবু চোখ বন্ধ করেই নেমে পড়েছিলেন, মেঘুদা তাঁর কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, আপনি হেঁটে যাবেন কী, সামনে বসুন, নীলু পেছনে যাক। আপনাকে হরিণটা দেখতে হবে না।

জিপটা আবার চলতে শুরু করার পর মেঘুদা বলল, ফেরার আগে দু'-একটা কাজ আছে। হরিণটাকে কে মেরেছে তা ধরা যাবে না, কিন্তু কিছু লোককে ধমকাতে হবে, ভয় দেখাতে হবে, এটা আমার ডিউটি। তোরা যেন হকচকিয়ে যাসনি।

সত্যি, মেঘুদার সেই রুদ্র রূপ আমরা আগে কখনও দেখিনি। এক-একটা কুঁড়েঘরের সামনে জিপ থামিয়ে মেঘুদা নেমে গিয়ে মেঘ গর্জনে চেঁচাতে লাগল। কে হরিণ মেরেছে এক্ষুনি না বললে গুলি চালাবে বলে রাইফেল তুলল, লাথি মেরে ভেঙে দিল জলের কলসি। একটা লোকের টুঁটি চেপে ধরল।

আহা, লোকগুলো জানে না, মেঘুদা আসলে ওদের ভালবাসে। ওদের জন্য কত মায়া! পদমর্যাদা দেখাবার জন্য অন্য রূপ ধারণ করেছে।

আমরা গাড়িতে বসে রইলুম, পরপর এরকম চলতেই লাগল। একটা ব্যাপার লক্ষ করলুম, জঙ্গলের অধিবাসীদের মধ্যে যুবক বা যুবতী নেই। শিশুও নেই। সবই বুড়ো-বুড়ি। জোয়ানরা কি সবাই আগে থেকে ভয়ে পালিয়েছে?

এ কথাটা চুনিলালবাবুকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, না গো, নীলুভাই। জোয়ান ছেলেমেয়েরা শহরে গ্রামে-গঞ্জে কিছু না-কিছু কাজ পেয়ে যায়। তারা জঙ্গলে থাকতে যাবে কেন? বুড়ো-বুড়ি, যাদের কোনও গতি নেই, যাদের ছেলে, ছেলের বউরা দেখে না, তাড়িয়ে দেয়, তারাই জঙ্গলে চলে আসে। কোনওরকমে টিকে থাকে, এখানেই মরে।

আরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার, কুঁড়েঘরগুলো কাছাকাছি নয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে, এখানেও এরা দল বাঁধেনি, কেউ কারুর ওপর যেন নির্ভরশীল হতে চায় না। এক একটি বুড়োকে দেখে বোঝাই যায়, তার গাছ কাটারও ক্ষমতা নেই, হরিণ মারাও তার পক্ষে অসাধ্য। তবু খাবার জোটায় কী করে কে জানে! কেউ কেউ অবশ্য ঘরের সামনে একটু ফাঁকা জায়গায় বেগুন বা লঙ্কা গাছ লাগিয়েছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ধমকানি দিতে দিতে মেঘুদাই ক্লান্ত হয়ে গেল। জিপের স্টিয়ারিং-এ বসে বলল, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ফেরা যাক।

প্রায় মাইল দেড়েক চালাবার পর মেঘুদা আচমকা ব্রেক কষল। আঙুল তুলে বলল, দেখ, ওই একটা লোক বসে আছে, এতক্ষণ সব

বুড়ো-ধুড়ো দেখলাম, এ লোকটার বয়েস তো খুব বেশি মনে হয় না। এ ব্যাটা হরিণ মারতে পারে। এটাকে একটু কড়কে দেওয়া দরকার।

মেঘুদা আবার নেমে পড়ল।

একটা খুবই নড়বড়ে কুঁড়েঘর, শুকনো ডালপালার ছাউনি। সামনে খানিকটা চতুষ্কোণ জমিতে কিসের যেন চাষ হয়েছে, একটা লোক সেই জমিতে বসে কঞ্চি দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। কোমরে এক টুকরো কাপড় জড়ানো, খালি গা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে, সেই পিঠের চামড়া দেখেই বোঝা 'যায়, তার বয়েস চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়। বেশ লম্বা, স্বাস্থ্যবান পুরুষ।

মেঘুদা যথারীতি লোকটার কাছে গিয়ে বকাবকি শুরু করে দিল।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, সে ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল না, মুখ তুলল না, এক মনে মাটি খুঁড়েই চলেছে। লোকটি মেঘুদার কথা গ্রাহ্যই করছে না, নাকি কানে কালা?

কুঁড়েঘরটা থেকে যে দৌড়ে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে আর এক চমক লাগল। একজন মেমসাহেব। যদিও শাড়ি পরা, কিন্তু ধপধপে ফর্সা গায়ের রং, মাথার চুল লাল রঙের। সে এসে প্রায় নাচের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল মেঘুদার সামনে।

কৌতূহল সামলাতে না পেরে আমি নেমে পড়ে এগিয়ে গেলুম।

কাছে যেতেই বোঝা গেল, মেমসাহেব নয়, অ্যালবিনো। পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত শ্বেতী, মুখখানা আদিবাসী রমণীদের মতন। তার চোখের পল্লব, ভুরুও সাদা। সে দুর্বোধ্য হিন্দিতে মেঘুদাকে কী যেন বলছে, এইটুকু বোঝা গেল যে, ওই লোকটি তার মরদ, সে অতি নিরীহ মানুষ। কারুর কোনও ক্ষতি করে না, এ জঙ্গলে কেউ তার নামে কোনও দোষ দিতে পারবে না। তবে সে কথা বলতে চায় না, সেই জন্য হুজুর তাকে ক্ষমা করে দিন।

লোকটি একবার মুখ ফেরাল। অতি শান্ত দুটি চোখ। সেই চোখ দেখে আমার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল কেন?

মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকটি তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আবার বলল, হুজুর, আমরা মাছ-মাংস ছুঁই না, আমরা হরিণ মারব কেন? আমাদের ঘরের পাশে হরিণ আসে, আমরা চেয়ে চেয়ে দেখি, কোনওদিন তাড়াও করিনি।

মেঘুদা বলল, তোমরা মারোনি, তা হলে কে মেরেছে? তোমরা জান নিশ্চয়ই—

স্ত্রীলোকটি বলল, ভগবান সাক্ষি আছেন হুজুর, আমরা কিছু জানি না,

এই জঙ্গলের কোনও লোক আমাদের কাছে আসে না

মেঘুদার যথেষ্ট কর্তব্য সারা হয়ে গিয়েছে, এবার সে পেছনে ফিরল। তার সঙ্গে জিপের দিকে আসতে আসতে হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালুম। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ভোলানাথ!

মেঘুদা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম, আমি ওই লোকটিকে চিনি।

মেঘুদা অবিশ্বাসের সুরে বসল, জঙ্গলের এই বোবা লোকটাকে তুই চিনিস?

আমি বললুম, ও বোবা নয়। তবে মাথার গোলমাল আছে। ও তো কাঁকড়াঝোড়ের জঙ্গলে ছিল, এখানে এল কী করে!

মেঘুদা আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমি দৌড়ে ফিরে গিয়ে লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে বললুম, ভোলানাথ, আমায় চিনতে পারো? আমি নীলু, নীললোহিত।

সে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। একটি কথাও বলল না।

আমি তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম, ভোলানাথ, তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে। আগেকার কথা তোমার মনে নেই? মানিকতলার সেই একটা বাড়িতে তুমি ছিলে, নিলয়দা, রূপা বউদি—

সে তবু কোনও উত্তর দিল না।

অ্যালবিনো স্ত্রীলোকটি ভয় পেয়ে গেছে। সে আমাকে আর কিছু বলতে দিল না, তার মরদকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

মেঘুদা আমার হাত ধরে বলল, কী হল রে ব্যাপারটা? তুই সত্যি ওকে চিনতে পেরেছিস?

আমি আচ্ছন্নের মতন দাঁড়িয়ে রইলুম একটুক্ষণ। তারপর বললুম, কোনও সন্দেহ নেই, চলো, যেতে যেতে সব বলছি।

ছ'-সাত বছর আগেকার কথা। মানিকতলার কাছে রাস্তায় প্রায় উলঙ্গ একটা পাগলকে কিছু লোক মিলে খুব মারছিল। পাগলটা নাকি গলা টিপে ধরতে গিয়েছিল এক ভদ্রমহিলার। লোকেরা মারতে মারতে হয়তো ওকে মেরেই ফেলত, কিন্তু সেই সময় নিলয়দা দেখতে পেয়ে গিয়ে বাধা দেয়। আজকাল সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরাও মানুষ মারতে খুব ভালবাসে। চোর-পকেটমার-ছেলেধরা সন্দেহে কেউ ধরা পড়লেই সত্যি-মিথ্যে বিচার করার আগেই সবাই মিলে তাকে মারতে শুরু করে। একেবারে শেষ করে দেয়। অনেকে মিলে মারলে কেউ হত্যাকারী হয় না, পুলিশেও ধরে না। এই বিংশ শতাব্দীর শেষেও লিঞ্চিং খুব বাড়ছে আমাদের দেশে।

পাগলটাকে যারা মারছিল, তারা রক্তের নেশায় নিলয়দাকে মেরে বসতে পারত, একজন লোক তার আগে জিজ্ঞেস করল, মশাই, এই ডেঞ্জারাস পাগলটার দায়িত্ব কে নেবে, আপনি নেবেন? নিলয়দা বলেছিলেন, হ্যাঁ নেব।

নিলয়দা পাগলটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। নিলয়দা সাধারণ চাকরি করা, ঘর-সংসার করা আর টাকা জমানোর নেশায় পাওয়া মানুষ নন। জীবন নিয়ে অনেক পরীক্ষা করতে ভালবাসেন। একটা পাগলকে লোকে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল, নিলয়দা ঠিক করলেন, তাকে বাঁচাবেন। সেই সময় আমি নিলয়দার বাড়িতে গিয়ে জুটেছিলুম।

লোকটি নিজের নাম-ধাম, পূর্ব জীবনের কথা কিছুই বলতে পারত না বলে আমরা তার নাম দিয়েছিলুম ভোলানাথ। বড়সড় চেহারা হলেও অধিকাংশ সময়েই সে খুব নিরীহ হয়ে থাকত। ধমক দিলে কুঁকড়ে যেত, মাঝে মাঝে আপন মনে গান গাইত। শুধু একটাই দোষ ছিল ওর, মেয়েদের সহ্য করতে পারত না একেবারে, মেয়েদের দেখলেই তাড়া করত, রূপা বউদির হাত কামড়ে দিতে গিয়েছিল একবার। এরকম একটা পাগলকে বাড়িতে রাখা মুশকিল, কিন্তু আবার রাস্তায় ছেড়ে দিলে লোকে মেরে ফেলবে বলে নিলয়দা ওকে কিছুতেই বাড়ি থেকে বের করে দিতে রাজি নন। রূপা বউদি রাগ করে চলে গেলেন বাপের বাড়িতে, ওঁদের ডিভোর্স হবার উপক্রম। বন্ধু-বান্ধব সবাই নিলয়দাকে বোঝাতে লাগল, শেষ পর্যন্ত কি তুমি নিজেই পাগল হলে? ওই একটা উটকো, মারকুট্টে রাস্তার পাগলের জন্য নিজের বিয়ে ভাঙবে?

আমার কাহিনীর মাঝখানে বাধা দিয়ে চুনিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা ওকে কোনও পাগলা গারদে ভর্তি করে দিলেন না কেন? নিশ্চয়ই কোনও মেয়ের কাছ থেকে দাগা পেয়েছিল, তাই বেচারা মেয়েদের সহ্য করতে পারত না।

আমি বললুম, সে চেষ্টা কি করা হয়নি ভাবছেন? খুব নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কেউ যে-কোনও লোককে পাগলা গারদে ভর্তি করে দিতে পারে না। এরকম আইন আছে। মনে করুন, আপনার সঙ্গে আমার খুব শত্রুতা আছে, আপনাকে আমি জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে যদি পাগলা গারদে ভর্তি করে দিই, তা হলে সারা জীবন আপনাকে সেখানেই থাকতে হবে। আমি পাগল নই, আমি পাগল নই, এ কথা বললে কেউ বিশ্বাস করে না। ভোলানাথকে আমরা রাস্তা থেকে ধরে এনেছি শুনে কোনও পাগলা গারদ ওকে নিতে চায়নি। দেখেন না, শহরের রাস্তায় কত পাগল-পাগলিনী ঘুরে বেড়ায়, কেউ তাদের দায়িত্ব নেয় না। কন্ট্রোলার

অফ ভ্যাগরন্সি বলে সরকারের একটা দফতর আছে, আমরা সেখানে গেছি, সেখানে জায়গা নেই। পুলিশ, হাসপাতাল, অনাথাশ্রম কেউ নেবে না। আমরা ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেছি। জেলের মধ্যেও অনেক পাগল রাখা হয়, সেখানেও জায়গা নেই। আমরা পয়সা খরচ করে ভোলানাথকে একটা মেসবাড়িতে রেখেছিলুম, কিছুদিন ভালই ছিল, একদিন সেই মেসের ঝিকে কামড়ে দিল, তারপর রাস্তার দুটি মেয়েকে। এবারে লোকেরা মারতে মারতে তুলে দিল পুলিশের হাতে। পরদিন কেস উঠল কোর্টে। আমরা ভাবলুম, যাক, এবার একটা হিল্লে হবে, কোর্টের ইনস্‌পেক্টরকে বুঝিয়ে বললুম, ও কিছু লেখাপড়া জানে, ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে, ওর কেউ নেই মনে হয়, ওকে জেলে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। কোর্ট ইনস্‌পেক্টর হাকিমের কানে কানে কী যেন বলল, হাকিম অমনি রায় দিলেন, আসামি বেকসুর খালাস ! বুঝুন ঠেলা ! ছাড়া পেলেই ভোলানাথ দৌড়ে এসে নিলয়দাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা ঘষতে লাগল। আবার নিলয়দার বাড়িতেই ওকে নিয়ে আসতে হয়। নিলয়দা জেদ ধরে তাই নিয়ে এলেন, রূপা বউদি ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। ওঁদের সংসার ভেঙে তছনছ হবার উপক্রম !

চুনিলালবাবু বললেন, মুশকিল, খুবই মুশকিল। লোকটিকে মরতেও দেওয়া যায় না, অথচ নিজের বউকে যদি কামড়ে দেয় !

আমি বললুম, বাড়িতে ডাক্তার এনেও দেখানো হয়েছিল, কোনও কাজ হয়নি। ডাক্তার বলেছিলেন, একদিন-দু'দিনের তো ব্যাপার নয়, টানা তিন-চার মাস চিকিৎসায় কিছু ফল হতে পারে। কিন্তু সেই তিন-চার মাস রাখা হবে কোথায় ? মিথ্যে কথা বলে নার্সিংহোমে রাখলেও নার্সদের কামড়ে দেবে। তখন আমরা একটা চরম উপায় ঠিক করলুম। অনেকের কাছে সেটা নিষ্ঠুর মনে হতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। নিলয়দার বউ আর ছেলের কথা ভেবে আমাকেই জোর করতে হয়েছিল। একদিন নিলয়দা আর আমি ভোলানাথকে একটা জিপগাড়িতে চাপিয়ে সোজা নিয়ে এলুম ঝাড়গ্রামে। তারপর বিকেলের দিকে কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলে। একটা ঝর্নার পাশে ভোলানাথকে বসিয়ে আমরা দু'জনে একটা ছুতো করে দৌড়ে পালিয়ে গেলুম। কয়েকটা বিস্কুটের টিন, কিছু চিঁড়ে-মুড়ি আর কয়েক কারটন সিগারেটও রেখে এসেছিলুম, লোকালয়ে ওকে ছেড়ে দিলে ওর বাঁচার কোনও আশা ছিল না। জঙ্গলে তবু যদি কোনও আদিম মানুষের মতন বাঁচতে পারে। জঙ্গলে কোনও মেয়েকে ও দেখবে না।

এই কাহিনীর এর পরেও আর একটা অংশ আছে, সেটা আর বলা দরকার মনে করলুম না।

চুনিলালবাবু উৎফুল্লভাবে বললেন, ঠিকই তো করেছেন, বেঁচে তো আছে দেখা যাচ্ছে।

মেঘুদা বলল, প্রকৃতির জঙ্গল থেকে শহরের জঙ্গল অনেক বেশি হিংস্র। এখানে তো একটা মেয়েলোকের সঙ্গে থাকে দেখছি, তাকে নিশ্চয়ই কামড়ায় না। কথা বলছিল না বটে, কিন্তু ওকে দেখে আমার পাগল বলেও মনে হয়নি। কেমন যেন দার্শনিকের মতন। হয়তো ওর পাগলামি সেরে গেছে।

আমি বললুম, আমারও, ওর চোখের দৃষ্টি দেখে একটুও পাগল মনে হল না। আগেও মাঝে মাঝে এরকম হত, কিন্তু মেয়ে দেখলেই ক্ষেপে যেত। এখন একটি মেয়ের কাছে দিব্যি বাধ্য হয়ে আছে।

মেঘুদা বলল, গাছপালা ওর অসুখ সারিয়ে দিয়েছে। অসম্ভব কিছু নয়। একসময় গাছপালার কাছ থেকেই তো মানুষের চিকিৎসার সমস্তরকম ওষুধ পাওয়া যেত !

রণছোড়জি এবেলা আমাদের সঙ্গে আসেনি। একজন ফরেস্ট গার্ড মৃত হরিণটাকে নিয়ে জিপে বসে আছে। তার নাম হরিদাস দাস, সে ওয়াচটাওয়ারে ডিউটি দেয়।

মেঘুদা তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, দাস, তুমি ওই লোকটাকে আর মেয়েটাকে চেনো ?

দাস বলল, হ্যাঁ স্যার, আগে দেখেছি কয়েকবার।

মেঘুদা বলল, ওই লোকটা কি পাগল ?

দাস বলল, তা বুঝিনি স্যার। ও চুপচাপ থাকে। কখনও কখনও নিজের মনে কথা বলে। বাড়ির কাছাকাছি থাকে বেশির ভাগ সময়, আবার এক একদিন গভীর জঙ্গলে ঢুকে গিয়ে গাছতলায় বসে থাকে। গুনগুন করে গান গায়।

মেঘুদা বলল, কাঁকড়াঝোড়ের জঙ্গল এখান থেকে বেশি দূর নয়। মাইল বত্রিশেক হবে। সেখান থেকে এই পাতাপাহাড়ীতে চলে আসা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। তুই কতদিন আগের কথা বললি নীলু ? ছ'-সাত বছর ? দাস, এরা কতদিন ধরে এখানে আছে ?

দাস বলল, তা বলতে পারব না স্যার। আমি বছর চারেক ধরে দেখছি। মেয়েটা পরে এসেছে। ওর নাম ধনিয়া। আগে পিছড়াগোড়া গাঁয়ে থাকত।

মেঘুদা বলল, পিছড়াগোড়া ? সে তো ধারাগিরির পেছন দিকটায়।

আমি গেছি সে গাঁয়ে। সেখান থেকে ও চলে এল কেন ? তুমি শুনেছ কিছু ?

দাস বলল, হ্যাঁ স্যার, জানি। ধনিয়ার সারা গায়ে শ্বেতী বলে লোকে ওকে খুব ভয় পেত। ওর বিয়ে হয়েছিল, স্বামীটা মারা গেল। সামান্য কিছু জমি ছিল, তাই নিয়ে চালিয়ে নিচ্ছিল, কিন্তু তারপর হল কী, ওদের গাঁয়ে পরপর তিনটে ছেলে জ্বরে পড়ে ধড়ফড়িয়ে মরল। একটার বয়েস তিন, একটার বয়েস চার আর একটা সাত বছরের। এর মধ্যে তিন বছরের ছেলেটাকে ধনিয়া নাকি অসুখের সময় কোলে নিয়েছিল। অমনি সারা গ্রামে রটে গেল যে, ধনিয়া ডাইনি !

চুনিলালবাবু শিউরে উঠে বললেন, সর্বনাশ। একবার ডাইনি বলে রটে গেলে যে লোকে তাদের পাথর দিয়ে থেঁতলে মেরে ফেলে !

মেঘুদা রাগে গরগর করতে করতে বলল, ডাইনি না ছাই ! ওর ওই জমিটা গ্রাস করার জন্য কেউ রটিয়ে দিয়েছে। বেশির ভাগ সময় তাই-ই হয়। তারপর কী হল ?

দাস বলল, ওকে মারতে মারতে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর ও দুধমুখী গ্রামে ভিক্ষে করত। সেখানেও টিকতে পারল না, সেখানেও ডাইনি বলে লোকে ঢিল মারত। একজন জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে মেরেছিল।

মেঘুদা বলল, তারপর জঙ্গলে পালিয়ে এল ? এখানে কেউ মারবে না। গাছপালারা মানুষকে মারে না।

দাস বলল, এখানে যে দু'-চার ঘর মানুষ আছে, তারাও ধনিয়াকে ভয় পায়। কাছে ঘেঁষে না। ওই লোকটার সঙ্গে কী করে ভাব হয়েছে জানি না। দু'জনে একসঙ্গে ঘর বেঁধে আছে। ধনিয়াই বেশির ভাগ কাজকর্ম করে। এই শুকনো মাটিতে কী করে যেন আলু ফলিয়েছে। সারা বছর আলু আর শাকপাতা খেয়ে থাকে।

মেঘুদা বলল, হ্যাঁ, আলুগাছই দেখলাম। তখন ঠিক বুঝতে পারিনি।

চুনিলালবাবু বললেন, একজন পাগল, একজন ডাইনি। দু'জনে মিলেছে, মিলেমিশে সুখে আছে। পৃথিবীতে প্রত্যেকের জন্যই আর একজন কেউ না-কেউ থাকে, তাই না ? কার সঙ্গে যে কার মিল হবে, সেটাই বুঝে ওঠা শক্ত হয়। আহা, ওরা দুটিতে—

চুনিলালবাবুর গলার আওয়াজ হাহাকারের মতন শোনাল। তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

॥ সাত ॥

বড় শিমুল গাছটা উধাও হবার রহস্যটা শেষ পর্যন্ত জানা গেছে।

বেলা তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আমরা আলবেলির ঝাপটার কাছে ছিলুম। সেখানে উঁচু উঁচু কয়েকটা পাথরের ঢিপি আছে। অনেক ঘোরাঘুরির পর রণছোড়জি একটা ঢিপি দেখিয়ে জোর দিয়ে বলল, এইখানে গাছটা ছিল। আলবাত ছিল। তার ভুল হতে পারে না। তখন আমরা সেই পাথরগুলো সরাতে লাগলুম, সেগুলো আলগা পাথর, বেশ কিছু সরাতেই দেখা গেল, সত্যিই তলার দিকে রয়ে গেছে বিশাল গুঁড়িটার অংশ, খুব মসৃণভাবে কাটা হয়েছে। তারপর সেটা যাতে চোখে না পড়ে সেই জন্য পাথর চাপা দিয়ে ঢিপি বানিয়ে রেখে গেছে কেউ।

আশ্চর্য ব্যাপার, দেখলে মনে হয় যেন সদ্য কাটা হয়েছে গাছটা। ওপরটা এখনও ভিজে ভিজে !

মেঘুদা দারুণ আহতভাবে বলল, ইস, এত বড় একটা গাছ ... এই জঙ্গলের শোভা ছিল, সেটা কেটে নিল ?

চুনিলালবাবু বললেন, কে কাটল ?

আমি বললুম, ইলেকট্রিক করাত !

মেঘুদা গম্ভীর হয়ে রইল। এই বিশাল গাছের গুঁড়ি কুড়ুল দিয়ে কাটা সোজা কথা নয়। পুরো দিন লেগে যেত। কিন্তু এইসব অঞ্চলেও আধুনিক যন্ত্রপাতি এসে গেছে। ইলেকট্রিক করাত দিয়ে রাত্তিরবেলা চুপি চুপি যে-কোনও গাছ বেআইনিভাবে কেটে ফেলা যায়।

এর পর পায়ে হেঁটে জঙ্গল ঘুরে দেখা গেল, শুধু সেই শিমুলগাছটা নয়, আরও শিমুল, সেগুন, শালগাছ কাটা হয়েছে, জঙ্গলের ইজারা দেওয়া অংশের অনেক বাইরে। শুধু মহুয়াগাছগুলো অক্ষত আছে। মালিক হুকুম দিলেও আদিবাসী শ্রমিকরা মহুয়াগাছ কিছুতেই কাটে না।

চুনিলালবাবু বারবার করুণভাবে ইস ইস করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ একবার ফুঁসে উঠে বললেন, মেঘুবাবু, আপনি গাছ কাটা একেবারে বন্ধ করে দিন। জঙ্গলে কেউ হাত ছোঁয়াতে পারবে না।

মেঘুদা ক্ষুণ্ণভাবে বলল, আমার সে ক্ষমতা নেই।

চুনিলালবাবু বললেন, আপনাকেই আমরা সরকারের লোক বলে জানি। আপনাকে আমরা ঘেরাও করব। ভূষণ চৌধারিবাবুর বাড়ির সামনে ধর্না দেব।

মেঘুদা বলল, লোক জোগাড় করতে পারেন তো দেখুন। এখানে কে আপনার কথা শুনবে ? সবাই আছে টাকা রোজগারের ধান্দায়। কাঠের

ব্যবসা এখানে বড় ব্যবসা। ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের জোগাড় করতে পারেন কি না দেখুন। যেখানে গাছ কাটা হচ্ছে, সেখানে গিয়ে যদি ছেলেমেয়েরা হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে বন্ধ হতে পারে।

চুনিলালবাবু দমে গিয়ে বললেন, ইস্কুলের ছেলেমেয়ে ? আহা, ছোট ছোট বাচ্চাদের কি এর মধ্যে জড়ানো উচিত ? যদি কোনও হাঙ্গামা হয় ? যদি তাদের মাথার ওপর গাছ কেটে ফেলে দেয় ?

মেঘুদা বলল, তা হলে বনোয়ারিপ্রসাদকে বোঝাতে পারেন কি না দেখুন। তিনি এখানকার এম এল এ, তিনি ইচ্ছে করলে অনেক লোক জোটাতে পারেন।

আমি বললুম, একজন এম এল এ কি কাঠের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যাবে ? তাদের টাকাতেই তো এরা ভোটে জেতে।

চুনিলালবাবু বললেন, একটা কিছু তো করতেই হবে। অত শক্তিশালী একটা শিমুলগাছ, আর সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজার মতন, অথচ মানুষের কাছে কত অসহায়।

মেঘুদা আমার দিকে ফিরে বলল, তুই ঠিক বলেছিস, নীলু! ইলেকট্রিক করাত দিয়ে গাছ কাটা বন্ধ করা দরকার। তাতে কিছুটা অন্তত কমবে। এটা আমার আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল!

মেঘুদাকে ঠিক এরকম পরামর্শ আমি দিইনি, তবু যাই হোক কৃতিত্বটা নিয়ে নিলুম।

আবার খানিকটা হেঁটে এসে, জিপে উঠে তক্ষুনি আমরা চললুম চৌধারিবাবুর ক্যাম্পের দিকে। দারোগা সাহেব যে বলেছিলেন, 'রংমতীর খেল,' এটা সেই খেলা। রংমতী নিজে তদারক করে বেআইনি গাছ কাটাচ্ছে। একদিন না-একদিন এই খবর ডি এফ ও কিংবা কনজারভেটর অফ ফরেস্ট-এর কানে যাবেই। তখন রেঞ্জারের নামে বদনাম হবে। তার চাকরি নিয়েও টানাটানি হতে পারে। রংমতী এইভাবে মেঘুদার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়।

রংমতী ক্যাম্পে উপস্থিত থাকলে তখনই একটা কাজিয়া শুরু হয়ে যেত। কিন্তু সে এখন নেই। সকালে বাড়ি ফিরে গিয়ে সন্ধের দিকে ফিরে আসে, শ্রমিকদের পাশাপাশি আর একটা তাঁবুতে সে একটি ঝিকে সঙ্গে নিয়ে থাকে, ভয়ডর নেই তার শরীরে।

মেঘুদা হুকুম দিল, রণছোড়, বিজলি করাত দুটো জিপে তুলে নে। কাল অফিসে জমা দিবি। কন্ট্রাক্টে ওই করাত দিয়ে গাছ কাটার কোনও কথা ছিল না।

শ্রমিকদের সর্দার মেঘুদাকে বাধা দিতে সাহস পেল না। কাছে এসে

সেলাম জানিয়ে বলল, বহিনজি এলে কী বলব ?

মেঘুদা বলল, কাল অফিসে দেখা করতে বলবে। বেআইনি গাছ কাটা চলছে। আমি নিজে দু'বেলা এসে দেখে যাব। একটাও অন্য গাছ কাটার সময় ধরা পড়লে শুধু মালিক নয়, তোমাদেরও ছাড়ব না। পুলিশ দিয়ে পেটাব। আলবেলি ঝাপটার কিনারে বড় শিমুলগাছটা কে কেটেছে ?

ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না এমন মুখ করে সর্দার দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, জানি না, সাহেব! কোন গাছটা বললেন ? আলবেলি ঝাপটা কাঁহা ?

রণছোড়জি বলল, সার, আজই জেনেছি যে এদের রোজ ডবল হয়ে গেছে। এরা রাতেও কাম করে।

আমার মনে পড়ে গেল, রংমতী বলেছিল, মজুররা মাইনে বাড়াবার দাবি করেছে, সে কিছুতেই বাড়াবে না। আসলে আগে থেকেই বাড়িয়ে দিয়েছে।

আর একটা চিন্তাও আমার মাথায় খেলে গেল। আমি মেঘুদাকে বললুম, ঝরি সিং নামে যে লোকটার গলা টিপে ধরেছিল ভূতে, সেই লোকটাকে একবার ডাকতে বল তো!

মেঘুদা কারণ জিজ্ঞেস করল না। হাঁক দিল, ঝরি সিং, এ ঝরি সিং ইধার আও!

শ্রমিকরা এরই মধ্যে কাজ বন্ধ করে, উনুনে আগুন দিয়ে চা বানাচ্ছে। দু'জন মহুয়ার বোতল খুলে বসেছে। সেই মহুয়া-পায়ীদের মধ্যেই একজন উঠে এল কাছে।

আমাদের রণছোড়জি বড় শিমুলগাছটার কাছে ভূত দেখেছিল। আমরাও সেই গাছ কাটার পরেও সেখানে গিয়ে একজনকে দেখেছি। ভূত বলে যদি কিছু থাকে, তা হলে সে ওই শিমুলগাছটার কাছেই ঘোরাফেরা করে। হয়তো ওই গাছেই সে থাকত। গাছটা কাটার জন্য সে রেগে গেছে।

মেঘুদাকে বললুম, তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো তো, শিমুলগাছটা ও-ই কেটেছে কি না!

আগের দিন লোকটির ভিতু ভিতু ভাব ছিল, গলার আওয়াজ ছিল মিনমিনে। আজ এর মধ্যেই খানিকটা মহুয়া গিলেছে। মদ খেলে অনেকেই বীরপুরুষ হয়ে যায়। মেঘুদার প্রশ্ন শুনে সে তেজের সঙ্গে উত্তর দিল যে, গাছ কাটাই তার কাজ, কোনদিন কোন গাছ কাটে তা তার মনে থাকে না।

মেঘুদা বলল, রাত্তিরে গাছ কাটা নিষেধ, তা জানিস না ?

এবারও সে চড়া গলায় বলল, সে কথা মালিককে বলুন। আমায় বলছেন কেন ?

এই লোকটির কথায় যুক্তি কাছে। মালিক যদি ওভারটাইম দিয়ে কাজ করায়, তাতে এরা রাজি হবে না কেন ? বর্ষার সময় এদের কাজ থাকবে না। মালিকের অনুপস্থিতিতে এদের বকাবকি করে লাভ নেই। এরা পুলিশকে ভয় পায়। এরা জানে, জঙ্গল বিভাগের অফিসারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

গাড়িতে উঠে রাগে গজগজ করতে করতে মেঘুদা বলল, ভূষণবাবুও বেআইনি কাজ করতেন, কিন্তু কিছুটা রেখে-ঢেকে। তার মেয়ে যে কিছুই মানছে না। আমি যদি স্ট্রং অ্যাকশন নিতে যাই—

চুনিলালবাবু হেসে বললেন, আপনি যদি রংমতীকে বিয়ে করতেন, লোকে বলত, আপনি ওদের ফেভার করছেন। বিয়ে করতে রাজি হননি, রাগারাগি হয়েছে, তাই লোকে বলবে, আপনি মিথ্যে অভিযোগে ওদের জড়াচ্ছেন। একে বলে শাঁখের করাত !

মেঘুদা বলল, লোকে যাই বলুক, আমি ওদের ছাড়ব না।

চুনিলালবাবু বললেন, কেউ কেউ নিশ্চয়ই রংমতীর কাছ থেকে টাকা খেয়ে বসে আছে। তারা কি আপনাকে ছাড়বে ? কলকাঠি নেড়ে আপনাকে ট্রান্সফার করিয়ে দেবে।

মেঘুদা বলল, আমার ট্রান্সফার ডিউ হয়ে গেছে। এরপর রাঁচির দিকে পোস্টিং হলে আমার ভালই হবে। ঠাণ্ডার জায়গা।

একটা ট্রাক আসছে, আমাদের পথ ছেড়ে দিতে হল। কাটা-গাছগুলো এই ট্রাকে যাবে। জঙ্গলের মধ্যে ট্রাক চলার গাঁক গাঁক শব্দ আমার বিশ্রী লাগে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, মেঘুদা, এক একটা ট্রাকে কত কাঠ যায়, তা চেক করার ব্যবস্থা নেই ?

মেঘুদা খানিকটা হতাশভাবে বলল, ব্যবস্থা সবই আছে। কিন্তু সব তো আমার নিজের পক্ষে দেখা সম্ভব না। এ দেশে করাপশান চট করে বন্ধ করা সম্ভব নয়। যত্রতত্র গাছ কেটে ফেলা যে মানুষের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর, সেটা যতদিন সাধারণ মানুষ না বুঝবে, ততদিন এটা চলতেই থাকবে !

চুনিলালবাবু বললেন, পৃথিবী থেকে সব গাছ শেষ হয়ে যাবে, এমন কি কখনও হতে পারে ?

মেঘুদা বললেন, যেভাবে চলছে, তাতে অসম্ভব কিছু নয়। সব

মরুভূমি হয়ে যাবে।

আমি বললুম, তখন আর কেউ ফরেস্ট রেঞ্জারের চাকরি পাবে না। কারণ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টই থাকবে না।

মেঘুদা বলল, তখন কোনও গায়ক থাকবে না, লেখক থাকবে না, বিজ্ঞানীও থাকবে না। গোটা মানুষ জাতিটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

চুনিলালবাবু বললেন, তার মানে, মানুষ জেনেশুনেই নিজের ক্ষতি করছে। আমি কী ভাবছি জানেন, মেঘুবাবু, আর যে-কটা দিন বাঁচব, বাড়িঘর ছেড়ে জঙ্গলে এসে কাটিয়ে দিলে কেমন হয় ? গাছতলায় থাকব, গাছের সঙ্গে কথা বলব, যারা গাছ কাটে, গাছকে কষ্ট দেয়, তাদের হয়ে ক্ষমা চাইব। আগেকার দিনে বানপ্রস্থ বলে একটা সুন্দর ব্যাপার ছিল। বুড়ো-বুড়িরা সবাই সংসার ছেড়ে বনে চলে যেত, শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিত।

মেঘুদা বলল, বানপ্রস্থ কথাটা শুনতে ভাল। কিন্তু সত্যি সত্যি আগেকার দিনের বুড়ো-বুড়িরা বনে চলে যেত কি ! সে রকম তো প্রমাণ পাই না। সংসারের মায়া বড় মায়া। ছেলে-পুলে, নাতি-নাতনী, বিষয়-সম্পত্তি, এসবের মায়া ক'জন কাটাতে পারে ? মহাভারতের ভীষ্মের কথাই ধরুন না, তাঁর তো নিজস্ব ওসব কিছুই ছিল না। সবার থেকে বেশি বুড়ো ছিলেন, তবু কি বানপ্রস্থে যেতে পেরেছিলেন ? কৌরব আর পাণ্ডবরা যখন ঝগড়া শুরু করল, তখনই তো ধৃতরাষ্ট্র বলতে পারতেন, আমি গান্ধারীকে নিয়ে বনে চললুম। তোমরা যা খুশি করো। তা তো বলেননি। বসে বসে লক্ষ লক্ষ নরহত্যা দেখলেন। এর নাম মায়া !

চুনিলালবাবু বললেন, ভীষ্মের সঙ্গে আমার তুলনা চলে না, আমি ক্ষুদ্র কীট, তবু আমি বোধ হয় পারব।

মেঘুদা বলল, ঠিক আছে। আমি থাকতে থাকতেই জঙ্গলের মধ্যে আপনার জন্য একটা ঘর বানিয়ে দেব।

চুনিলালবাবু আজ আর আমাদের সঙ্গে বাংলোয় ফিরতে চাইলেন না। প্রায় জোর করেই সাইকেলে উঠে পড়লেন।

মেঘুদা আমাকে বলল, ভদ্রলোকের বোধ হয় হঠাৎ বউ-ছেলের কথা মনে পড়ে গেছে। আজ কি ওর পক্ষে একা থাকাটা ঠিক হবে ? হয়তো কান্নাকাটি করবেন।

আমি বললুম, মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করা তো খারাপ কিছু না। আমিও তো কাঁদি।

মেঘুদা ভুরু তুলে বলল, কেন, তোর আবার কী দুঃখু ?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, কোনও দুঃখ নেই, সেই জন্যই তো

মাঝে মাঝে কান্না পায় ! খানিকক্ষণ চোখের জল ফেললে শরীরটা বেশ পবিত্র পবিত্র লাগে ।

মেঘুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি এক হতভাগা । আমার কখনও কান্না পায় না । মায়ের মৃত্যুর সময় কেঁদেছিলাম, হ্যাঁ, সে তো বারো-তেরো বছর আগের কথা, তারপর থেকে আর কখনও, এমন কি বাবার মৃত্যুতেও কাঁদিনি, তখন এত ব্যস্ত ছিলাম, সবাইকে খবর দেওয়া, সব ব্যবস্থা করা, দাদা তখন বিদেশে—

আমি বললুম, প্রেমে পড়ো, তারপর ব্যর্থ হও, তখন ঠিক কাঁদবে ।

মেঘুদা আমার মাথায় একটা চাঁটি লাগাল ।

কিন্তু একটি প্রেমের দৃশ্য আমি দেখলুম একটু পরেই ।

সন্ধের ঠিক মুখে মুখে একটি ঘোড়া আর একটি মোটর সাইকেল এসে থামল বাংলোর সামনে ।

ঘোড়ার পিঠে রংমতী, মোটর সাইকেলে ওদেরই এক বাঙালি কর্মচারি, তার নাম পরেশ সান্যাল । বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা, মাথার চুল কদম-ছাঁট, ওই লোকটাকে আগে দেখেছি একবার । চোখ দুটিতে কুচক্রীর মতন ভাব আছে ।

আমি আর মেঘুদা বারান্দাতেই বসে ছিলাম, পরেশ সান্যাল মোটর বাইক থেকে নেমে বলল, নমস্কার, নমস্কার ।

রংমতী ঘোড়াতেই বসে রইল, আমাদের গ্রাহ্যই করল না, তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল, রণছোড়িয়া, এ রণছোড়িয়া ।

রণছোড়জি ওই দুটি যান-বাহনের আওয়াজ শুনে কাছেই ছিল, বারান্দায় এসে হাত জোড় করল ।

রংমতী তাকে জিজ্ঞেস করল, মেরা ইলেকট্রিক স কৌন চোরি করকে লায়া ?

রণছোড়জি মেঘুদার দিকে তাকাল ।

মেঘুদা বলল, রণছোড়, বলে দে, বিজলি করাত কেউ চুরি করে আনেনি । সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে ।

রংমতী রণছোড়জির দিকে আঙুল তুলে বলল, সব লোগ দেখা, তু আপনা হাঁথ সে উঠায়া ।

রণছোড়জি বেশ ভয় পেয়ে গেছে বোঝা গেল । সে মেঘুদার কর্মচারী ঠিকই, কিন্তু এই সাহেব একদিন বদলি হয়ে যাবে, ভূষণ চৌধারি আর তার মেয়ের প্রতাপ তো অব্যাহতই থাকবে । জলে বাস করে কি কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করা যায় ? কোনদিন কোন ফাঁদে তাকে ফেলে দেবে তার ঠিক নেই ।

মেঘুদা বলল, রণছোড়, তুই বলে দে, তুই আমার হুকুমে তুলেছিস । আমি সরকারি আদেশ দিয়েছি ।

রংমতী এবার পাশের দিকে তাকিয়ে বলল, পরেশবাবু, আপনি সরকারি অফিসারকে বলুন, আমরা ওই দুটো ফিরত নিতে এসেছি ।

মেঘুদা সেই কথা শুনেও পরেশবাবুর মুখ দিয়ে পুনরুচ্চারিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল । তারপর বলল, পরেশবাবু, আপনার মালকানিকে বলে দিন, ফেরত পাবার জন্য কাল অফিসে দরখাস্ত করতে হবে ।

রংমতী বলল, পরেশবাবু, আপনি জিজ্ঞেস করুন, কোন আইনে সরকারি অফিসার আমার বিজলি করাত উঠিয়ে এনেছে ।

মেঘুদা বলল, পরেশবাবু আপনি জানিয়ে দিন যে সরকার যখন জঙ্গলের ডাক চড়িয়েছিল, তখন বিজলি করাত ব্যবহার করার কোনও শর্ত ছিল না ।

রংমতী বলল, পরেশবাবু, আপনি জিজ্ঞেস করুন, দু'-চারদিনের মধ্যে বর্ষা নেমে যাবে, তার আগে আমরা কাজ শেষ করব কী করে !

মেঘুদা বলল, পরেশবাবু, আপনি বলে দিন, কাজ শেষ করা কন্ট্রাক্টারের দায়িত্ব । সরকার তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না । আরও বলে দিন, যতগুলো গাছ মার্ক করা আছে, তার বেশি কাটলে শাস্তি হবে, জরিমানা হবে ।

রংমতীর ঘোড়াটা ছটফটিয়ে উঠল । রংমতী সেটার লাগাম ধরে টানতেই সে চিঁ হিঁ করে ডেকে উঠল সামনের দু'পা উঁচিয়ে । রংমতী হাওয়ায় ছপটি কষাল শপাং করে । ঠিক হিন্দি সিনেমার নায়িকা !

মেঘুদা বলল, পরেশবাবু, আপনারা এসে বসুন । এই রণছোড়, আর দুটো কুর্সি নিয়ে আয় ।

রংমতী মুখঝামটা দিয়ে বলল, পরেশবাবু, আপনি সরকারের নোকরকে বলে দিন, আমরা এখানে কুর্সিতে বসার জন্য আসিনি । আমার বিজলি করাত এক্ষুনি ফেরত চাই ।

মেঘুদা বলল, পরেশবাবু, টেন্ডার জমা দিয়েছিলেন ভূষণ চৌধারি, তার নামে লাইসেন্স । যা বলার তিনি বলবেন, অন্য কারুর সঙ্গে আমি আলোচনা করতে রাজি নই ।

রংমতী এবার সোজাসুজি মেঘুদার দিকে তাকাল । মেঘুদাও চোখ ফিরিয়ে নিল না । দু'জনের দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল কয়েক মুহূর্ত ।

এই দুর্দান্ত হান্টারওয়ালিকে দেখলে যদিও মনে হয় না যে এ কখনও কাঁদতে পারে । তবু আমার মনে হল, এক্ষুনি বুঝি কেঁদে ফেলবে !

এবার পরেশবাবু নিজে থেকেই বলল, মিঃ ঘোষাল, কেন আমাদের

কাজের ক্ষতি করাচ্ছেন ? জরিমানা যদি দিতে হয়, কত লাগবে বলুন, আমরা এক্ষুনি আপনার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। করাত দুটো আমাদের ফেরত চাই।

মেঘুদা বলল, বললাম তো, কাল অফিসে দরখাস্ত পাঠাবেন। জরিমানা যদি দিতে হয়, অফিসে জমা দিয়ে রশিদ নিয়ে যাবেন। এটা আমার কোয়ার্টার, এখানে আমি অফিসের কাজ করি না।

পরেশবাবু বলল, কেন মশাই ঝামেলা পাকাচ্ছেন। যাতে আমাদেরও সুবিধে হয়, আপনারও সুবিধে হয়, সে রকম একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।

মেঘুদা বলল, আপনাদের কিসে সুবিধে হবে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে-চাই না। আমার তো আপাতত কোনও অসুবিধে দেখছি না।

পরেশবাবু ভয় দেখাবার ভঙ্গিতে বলল, আপনি আমাদের কাজ বন্ধ করে দিতে চান ?

মেঘুদা বলল, এতকাল কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটা হয়েছে, কাজ বন্ধ করার তো কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। আপনাদেরও আমি কাজ বন্ধ করছি না, তিরিশে জুন পর্যন্ত সময় আছে, বেশি করে কামিন লাগান।

রংমতী বলল, পরেশবাবু, সরকারের নোকরকে জানিয়ে দিন, আমরা কোন অস্তর দিয়ে গাছ কাটব, কটা কামিন লাগাব, সে সব কথা ওর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। বিজলি করাত ফিরত দেবে কি না বলুন।

মেঘুদা এবার কঠোরভাবে বলল, বারবার এক কথা আমি বলতে চাই না। আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। আপনারা এখানে বসতে পারেন, চা খেতে পারেন, অন্য কথা বলতে চান তো বলুন !

যা ভেবেছিলুম, অনেকটা তাই-ই ঘটল। রংমতী কেঁদে ফেলল না বটে, হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গেল মাটিতে। একেবারে অজ্ঞান।

আমরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলুম। রংমতীকে মাটি থেকে তোলার জন্য মেঘুদা হাত বাড়িয়েও হাত গুটিয়ে নিল, পরেশবাবু আর আমি ধরাধরি করে তাকে তুললুম। রণছোড়জি জলের জাগ নিয়ে এল, বারান্দায় রংমতীকে শুইয়ে তার মুখে জলের ঝাপটা দেবার পরই অবশ্য তার জ্ঞান ফিরে এল।

মেঘুদার দিকে একবার কটমটিয়ে তাকিয়ে সে পরেশবাবুকে বলল, চলুন, আমার কিছু হয়নি।

মেঘুদা পরেশের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা একটু বিশ্রাম নিয়ে যান। গরম দুধ আনতে বলব ? তাতে চাঙ্গা লাগবে।

রংমতী আর কোনও কথাই শুনল না। জোর করে আবার ঘোড়ায় চেপে টগবগিয়ে ছুটে গেল। পরেশের আগেই।

পরেশও মোটর বাইকে স্টার্ট দিতে দিতে বলল, কাজটা ভাল করলেন না ঘোষাল সাহেব !

মেঘুদা বলল, গেট লস্ট !

আমি হো হো করে হেসে উঠলুম। তারপর বললুম, ঠিক যেন একটা নাটক হয়ে গেল, তাই না ?

মেঘুদা বলল, হারামজাদা পরেশটার কী সাহস, আমাকে ভয় দেখায় !

আমি বললুম, ওর কথা ছাড়ো। মেঘুদা এ যে দেখছি কেস বেশ সিরিয়াস !

মেঘুদা বলল, তার মানে ?

আমি বললুম, রংমতী তো তোমার প্রেমে ডগোমগো দেখছি !

মেঘুদা বলল, কী পাগলের মতন কথা বলছিস ! ওরা সাতজন্মে প্রেম কাকে বলে জানে না। ও মেয়ে তো পুরুষের দ্বিগুণ ! কী বিচ্ছিরি ভাষা, আমাকে বারবার সরকারের নোকর বলে অপমান করছিল দেখছিলি ?

আমি বললুম, ওটাও প্রেমের ভাষা হতে পারে। অনুরাগের আগে শুধু রাগ। তা ছাড়া হিন্দিতে চাকরিকে তো নোকরিই বলে। বাংলাতেও চাকরি মানে চাকরগিরি !

মেঘুদা বলল, তা হলেও বাংলায় কেউ সরকারের চাকর বলে না।

আমি বললুম, ইংরিজি করে গভর্নমেন্ট সারভেন্ট বললে ওই একই হয়। সে যাই হোক, মেয়েটার মুখখানা লাল হয়ে গিয়েছিল। প্রেমে পতন এবং মূর্ছা ! একেবারে ক্লাসিকাল স্টাইল।

মেঘুদা বলল, ওর নিশ্চয়ই মৃগি রোগ আছে।

আমি বললুম, তুমি ওকে গরম দুধ খাওয়াতে চাইছিলে !

মেঘুদা এবার গলার আওয়াজ অতিরিক্ত গম্ভীর করে বলল, সেটা ভদ্রতা !

আমি বললুম, মেঘুদা, তুমি যা-ই বল, ও মেয়ে তার প্রাণমন তোমাকে সঁপে বসে আছে। সাধারণ মেয়ে তো নয়, বীরাঙ্গনা। কিছুতেই তোমাকে ছাড়বে না। দেবী চৌধুরানীর মতন তোমাকে—

মেঘুদা বলল, তুই আবার প্রেম-বিশারদ হলি কবে থেকে ?

আমি বললুম, আমার কথা মেলে কি না দেখো। কত বাজি ?

মেঘুদা বলল, ও মেয়েটাকে দেখলেই তো আমার ভয় করে। এবার এই জঙ্গলের মায়া কাটিয়ে আমাকে সরে পড়তে হবে। সামনের সপ্তাহে ডি এফ ও সাহেব আসছেন, তাঁর কাছে ট্রান্সফার চাইব। যদি দেরি হয়, চাকরিই ছেড়ে দেব। সুন্দরবনের গোসাবায় আমাদের খানিকটা জমি

আছে, সেখানে বেগুন আর লঙ্কার চাষ করব। এ তল্লাটের আর ছায়া মাড়াব না কোনওদিন!

॥ আট ॥

ভোরের হাওয়ায় নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে মনে হল, এ জীবনে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। নদী দেখতে আমার সবসময়ই ভাল লাগে। কিন্তু এমন জনমনুষ্যহীন হলে মনে হয় এখন এই নদীটা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব, একটি পয়সাও খরচ না করে আমি উপহার হিসেবে পেয়েছি। এ রকম টাটকা বাতাস জীবনে দু'-চারদিনই মাত্র পাওয়া যায়।

বর্ষাকালে এই নদীতে নৌকো চলে, একবার নাকি বন্যাও হয়েছিল, এখন বেশ শীর্ণ অবস্থা। কে যেন প্রশ্ন তুলেছিল, নদী ঠিক কাকে বলে, প্রবাহিত জলটাই নদী, না এই খাতটাই নদী। এ দিকের তীরের কাছে সরু জলের রেখা, তারপর বালি, অনেকখানি বালি, ওপারের দিকে আবার একটু জলের ধারা। ঠিক মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর দু'-তিন মাস বাদে এখানে থাকবে অগাধ জল, বড় বড় ঢেউ উঠবে, আর এখন আমার পায়ের পাতাও শুকনো।

আজ এখনও কেউ জাগেনি, এমন কি চিখরিয়াকেও দেখা যাচ্ছে না। পাজামা আর গেঞ্জি পরে শুয়েছিলুম রাত্তিরে, তাই পরেই বেরিয়ে এসেছি, খালি পায়ে, দাঁত মাজিনি, চোখে জলও দিইনি। একটা নতুন দিনের উদ্বোধন হচ্ছে, সচরাচর এটা দেখা হয় না। পুবের আকাশ সদ্য অরুণ বর্ণ।

নদীর এক দিকে মাঠ, মাঠের পর মাঠ, ওদিকে গাছপালা নেই, ওই সব মাঠে চাষ-বাস হয়, আপাতত রুক্ষ পড়ে আছে। আর এই দিকে, বাংলোর পর থেকেই জঙ্গল। কেন এক দিকে জঙ্গল আর অন্য দিকে সবুজ প্রায় নেই কেন? একই নদীর দু' ধারে দু' রকম দৃশ্য হয় কী করে! কিংবা, ওদিকেও এক সময় অরণ্য ছিল, মানুষ তা নির্মূল করে চাষের জমি বানিয়েছে? জনসংখ্যা যত বাড়বে, জনসংখ্যা মানেই তো ক্ষুধার্ত পেট, ততই তাদের জন্য ফসলের ক্ষেত বাড়াতে হবে। জঙ্গল কেটে সাফ না করলে জমি বাড়বে কী করে! বিজ্ঞানের এত উন্নতি হচ্ছে, মরুভূমিতে ফসল ফলানো যায় না? ইজরাইল নামে দেশটা তো পেরেছে। তারা ছ'শো মাইল দূর থেকে পাইপে করে জল টেনে এনে মরুভূমি উর্বর করে ফেলেছে।

বি বি সি-তে পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা নিয়ে একটা অনুষ্ঠান দেখেছিলুম

একবার। একজন বিজ্ঞানী বলছিলেন, নতুন রকম ধানের বীজ শিগগিরই তৈরি করা যাবে, যাতে একটা ফুটবল খেলার মাঠের মতন সমান জমিতে এত ধান ফলবে, যাকে এক হাজার জন মানুষের সারা বছরের খাদ্য পাওয়া যাবে। শুনে আমার কী দারুণ আনন্দ হয়েছিল! এত কম জমিতে এত বেশি ফসল ফলানো সম্ভব হলে কত অরণ্য বাঁচানো যাবে! এইসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফল একদিন না-একদিন আমাদের দেশেও আসবে নিশ্চয়ই।

আজকেই প্রথম যেন এই জায়গাটা আমি সত্যিকারের উপভোগ করতে পারছি। এই নির্জনতা, এই মৃদু বাতাস, গাছপালার সবুজ রঙের ঝাপটা, যেন কতদিন পাইনি। ভূতটুত, গাছ কাটা নিয়ে ঝগড়া, এসব অতি বাজে ব্যাপার! এইসব ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার জন্য কী কেউ জঙ্গলে আসে! তবে, ভোলানাথকে হঠাৎ আবার দেখতে পেয়ে সত্যিকারের আনন্দ পেয়েছি। ফিরে গিয়েই নিলয়দাকে জানাতে হবে, নিলয়দা দারুণ খুশি হবে। ভোলানাথের ব্যাপারে আমাদের দু'জনের মনেই খানিকটা অপরাধ বোধ ছিল। সে তো বেঁচেই আছে, আগেকার চেয়ে ভাল আছে। তার অমন শান্ত চোখ তো আমরা আগে দেখিনি!

নদীর ধারে ধারে কিছু কিছু ঝোপঝাড় চোখে পড়ে। এক জায়গায় আমি থমকে দাঁড়ালুম। এই সেই ফুল! পৃথিবীতে আমি যত রকম ফুল দেখেছি, তার মধ্যে এই ফুলটাই আমার সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগে। বাংলায় এর খুব সাধারণ নাম, ঝুমকো। ইংরিজিতে বলে প্যাশান ফ্লাওয়ার। মৃদু আমেজ মাখা গন্ধ পাওয়া যায়। অপরূপ এই ফুলের গড়ন। গাঢ় নীল, হালকা নীল আর সামান্য সাদা মেশানো, দু'-তিন পরত পাপড়িতে কী নিখুঁত কারুকার্য, অথচ এই ফুল এমনই স্পর্শকাতর যে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নিলে একটু পরেই নেতিয়ে যায়, একবেলাও রাখা যায় না। এত সূক্ষ্ম কাজ, যেন একটা শিল্পকীর্তি, অথচ ফোটে মাত্র এক দিনের জন্য!

লতানে গাছটা ঝোপের মতন হয়ে আছে, তার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি ঝুমকো ফুল। ভোরের আলো তার ওপরে পড়ে কাঁপছে। ভোরের আলো, না অন্য কিছু? আমি কাছে এগোলুম না, তবু আমার চোখে যেন ঘোর লাগল। কী কাঁপছে ওখানে। এমন কী হতে পারে, ওই ফুলের আত্মাটা বাইরে বেরিয়ে এসে রোদ পোহাচ্ছে! ফুলের কি আত্মা থাকে? কিন্তু কিছু একটা কাঁপছে ঠিকই, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার সর্বাঙ্গে শিহরন হচ্ছে।

জার্মানির এক প্রাচীন উপজাতির নাম টিউটন। তাদের একটা

পুরাণ-কাহিনী পড়েছিলুম এক সময়। তাদের আলোর দেবতার নাম বালডুর, এক দিন অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেলেন এক নির্জন ঝর্নায় এক অপরূপ কন্যা মশগুল হয়ে স্নান করছে। তার রূপের বিভা যেন ফেটে পড়ছে, সে সম্পূর্ণ নগ্ন। লুকিয়ে চুরিয়ে এরকম দৃশ্য দেখতে নেই, কিন্তু বালডুর সরে যেতে পারলেন না, তাঁর শরীরের আলোর বিচ্ছুরণ যেন সেই কন্যাকে আরও আভা দিতে লাগল। সেই কন্যাও সাধারণ কেউ নয়, তার নাম নান্না, সে ফুলদের রাজকুমারী। নান্নার রূপ আলোর দেবতার হৃদয় বিদীর্ণ করে দিল এক সময়। আলোর দেবতা এসে ফুল-রাজকুমারীকে আলিঙ্গন করলেন।

সেই দৃশ্যটাই কি আমি দেখলুম এই মাত্র?

আমি অস্ফুট স্বরে বলে উঠলুম, নান্না, নান্না!

একটু দূরে কয়েকটা পাখি কোলাহল করছে। ছাই ছাই রং, চিনি, ওই পাখিগুলোর নাম ছাতারে। গুনে দেখলুম, ঠিক সাতটা পাখি। ছাতিম গাছ বা সপ্তপর্ণীর এক পল্লবে যেমন সাতটি পাতা থাকে, তেমনি ছাতারে পাখিরাও সাতজন এক সঙ্গে ঘোরে। কে ওদের ওই সাত সংখ্যাটা ঠিক করে দিয়েছে?

নদীর চরে বসে ছাতারে পাখিরা চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। বাচ্চাদের মতন ওরা যখন-তখন ঝগড়াও করে। ওদের গলার আওয়াজ ভাল না। কাকও কালো, কোকিলও কালো, আকারও প্রায় এক, তবু ওদের গলার আওয়াজে এত তফাত কেন? আমরা মনে করি, কোকিলের গলার সুর খুব মিষ্টি, পাখিরাও কি তাই মনে করে? পাখিদের সমাজে কি কোকিলকে শিল্পী বলে ধরা হয়? আর সব পাখি নিজেদের বাসায় ডিম পাড়ে, নিজের কাচ্চা-বাচ্চাদের খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে, একমাত্র কোকিলই পরের বাসায় ডিম পাড়ে, নিজের সন্তানদের কোনও দায়িত্ব নেয় না কেন? এ সমস্যার কে উত্তর দেবে? পাখিদের সমাজে কি শিল্পীদের সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাই কোকিলের জন্য ওই রকম আলাদা ব্যবস্থা?

পাখিদের সুরজ্ঞান আছে কি না, তা আমি জানি না। কিন্তু গাছপালারা যে গান-বাজনা ভালবাসে, তা প্রমাণ হয়ে গেছে। খুব টানা, সুরেলা, ঢিমে লয়ের গান-বাজনা বৃক্ষ-লতারা পছন্দ করে, তারা ডগা বাড়িয়ে শোনে, আর রক অ্যান্ড রোলের মতন জগঝম্প, চেঁচামেচির গানবাজনা শুনলে তারা বিরক্ত হয়ে কুঁকড়ে যায়। বিশুদ্ধ সঙ্গীত শোনালে গাছেদের বৃদ্ধি দ্রুত হয়।

ভোরবেলা একলা একলা ঘুরলেই শুধু এইসব কথা মনে আসে।

ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করতে হয় যে এই চোখে দেখা বাস্তব জগৎটাও কী অপার রহস্যময়। এত রহস্যের কূলকিনারা না পেয়ে মানুষ সব কিছুর দায় চাপিয়েছে ভগবানের ঘাড়ে। ওই ঝুমকো ফুলের রঙও কি ভগবান বসে বসে আঁকেন?

চায়ের তেষ্টা পেয়েছে, এবার ফিরতে হল।

বাংলোর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিমলি, তার হাতে এক ঘটি দুধ। পেতলের ঘটিটি সোনার মতন উজ্জ্বল করে মাজা। বিমলির শরীরটা যেন মাটি দিয়ে গড়া, অবিকল নদীর ধারের এঁটেল মাটির মতন তার গায়ের রং, বছর তিরিশেক বয়েস হবে। তার পরনের নীল পাড় সাদা শাড়িটা কিন্তু বেশ ধপধপে করে কাচা।

সে আসে নদীর ওপারের একটা গ্রাম থেকে। বাংলোর মধ্যে ঢোকার হুকুম নেই তার। চিখরিয়া কি এখনও জাগেনি?

সরল ও সম্পূর্ণ দৃষ্টি মেলে বিমলি আমার দিকে তাকাল। সাধারণত মেয়েরা পুরুষদের দিকে এরকমভাবে চায় না। বিমলির যেন কোনও সঙ্কোচের বালাই নেই।

চিখরিয়া দেখতে পেলেই বিমলিকে বকাবকি করবে, তবু আমি সেখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তোমার বাড়ি কোথায়?

মুখে কিছু না বলে সে হাত দিয়ে নদীর পরপার দেখাল।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, তোমাদের বাড়িতে কটা গরু আছে?

এবার সে বলল, গরু নেই ছে, দোঠো কাঁড়ার।

ও মোষের দুধ, আমরা রোজ মোষের দুধের চা খাচ্ছি! তা মন্দ কী! মেঘুদার পয়সা খরচ হয়, এক দিন আমি দুধের দাম দিতে পারি নিশ্চয়ই। চুনিলালবাবু এখানে রোজ রোজ খেতে লজ্জা পান, তাই এক দিন একটা লাউ আর এক দিন প্রায় দু' কিলো ঝিঙে নিয়ে এসেছিলেন।

সঙ্গে টাকাপয়সা নেই, ভেতর থেকে এনে দিতে হবে, জিজ্ঞেস করলুম, তোমার দুধের দাম কত?

সে উত্তর না দিয়ে সামনের দিকে তাকাল। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে চিখরিয়া। আমাকে বকল না। বিমলিকেও মুখ ঝামটা দিল না, তার হাত থেকে দুধের ঘটিটা নিয়ে বলল, কাল বেশি করে, দু' ঘটি দুধ আনবি, ক্ষীর বানাব।

চিখরিয়া আজ বকুনি দিল না কেন? হঠাৎ আজ সকালে তার স্বভাব বদলে গেল কী করে! এটাও রহস্যময় ব্যাপার। ভোরে ঘুম না ভাঙলে এসব টের পাওয়া যায় না। ভোরবেলার মানুষ, আর সারা দিনের মানুষের মধ্যে অনেক তফাত হয়ে যায়।

বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ মেঘুদা বেরুবার জন্য তৈরি হল, বাইরে কিছু কাজ আছে তার। আমি বারান্দায় বসে বসেই সারা দিন কাটিয়ে দেব ঠিক করেছি। মেঘুদার ঘরে বই আছে অনেক।

এই সময় খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে চলে এলেন চুনিলালবাবু। সাইকেলটা বারান্দার গায়ে ঠেসান দিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, খুব ভাল খবর আছে, দারুণ খবর!

একটা যুদ্ধ বিরতির সংবাদ শুনলে মানুষ যেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, চুনিলালবাবুর মুখচোখের অবস্থা সেই রকম।

বারান্দায় উঠে এসে বললেন, কেল্লা ফতে! বুঝলেন মেঘুবাবু, বুঝলে নীলুভাই, আর কোনও চিন্তা নেই। ভূষণ চৌধারিবাবু দারুণ অসুস্থ, সে খবর পেয়েছেন কী?

মেঘুদা বলল, টাইফয়েড হয়েছে শুনেছি।

চুনিলালবাবু বললেন, সে তো পুরনো খবর। কাল শেষ রাত্রে কী হয়েছে জানেন না? ভূষণবাবু নিজে নিজে উঠে প্রস্রাব করতে গিয়েছিলেন, মাথা ঘুরে বাথরুমের মধ্যে, শ্বেতপাথরে বাঁধানো বাথরুম, এত জোর চোট লেগেছে যে একেবারে অজ্ঞান। কত রক্ত যে বেরিয়েছে! বাঁচবেন কি না সন্দেহ!

আনন্দে চুনিলালবাবুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

আমি আর মেঘুদা পরস্পরের দিকে তাকালুম। চুনিলালবাবু নরম মনের মানুষ, একজন লোক প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছেছে বলে তিনি খুশিতে নাচবেন কেন? ভূষণ চৌধারি লোক ভাল নয়, মেঘুদার সঙ্গে একটা শত্রুতার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে, তবু তার মৃত্যু কেউ চায় না। চুনিলালবাবুর হঠাৎ কী হল!

তিনি বললেন, সক্কালেই খবর পেয়ে আমি দেখতে গেলাম।

মেঘুদা বলল, অজ্ঞান হয়ে রয়েছে, তাও দেখতে গেলেন?

চুনিলালবাবু বললেন, বাঃ, অত অসুখের খবর শুনেও যাব না? লোকে বলবে কী! শুধু আমি কেন, অনেকে গেছে, ওঁর বেডরুমে দাঁড়াবার জায়গা নেই।

মেঘুদা বলল, আসুন বসুন তো। বসে ভাল করে গুছিয়ে বলুন। সুসংবাদটা কী তা এখনও বুঝতে পারছি না।

চুনিলালবাবু চেয়ারে বসে একটা বিড়ি ধরালেন। তৃপ্তির সঙ্গে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আমি বোকাসোকা মানুষ, সে রকম জ্ঞানবুদ্ধি নেই, তবু আমার বুদ্ধিতেই কিন্তু এটা হল।

মেঘুদা বলল, কী হল?

চুনিলালবাবু বললেন, একেবারে ফাইনাল করে এসেছি। ভূষণবাবু সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন, আর নড়চড় হবে না!

মেঘুদা বলল, তার মানে, ভূষণবাবুর জ্ঞান ফিরে এসেছে?

চুনিলালবাবু বললেন, হ্যাঁ, তা তো ফিরে এসেছে অনেক আগেই। এক ঘণ্টা মতন অজ্ঞান ছিলেন। অনেক রক্ত পড়েছে তো, জ্ঞান হবার পরেই বারবার বলতে লাগলেন, আমি আর বাঁচব না, আমি আর বাঁচব না। উকিলকে ডেকে পাঠানো হয়েছে উইল করবার জন্য। ডাক্তার কোবরেজ দু' জন পাশে বসে আছে। ভূষণবাবু সবাইকে ডেকে ডেকে ক্ষমা চাইছেন। এখানকার নিয়ম আছে, মৃত্যুর আগে সব মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়। ওপারে গিয়ে চিত্রগুপ্তর কাছে জবাবদিহি করার ভয় আছে তো। আমাকেও কাছে ডেকে হাত জড়িয়ে ধরে কাতর গলায় বললেন, সাউজি, যা যা অন্যায় করেছি, ক্ষমা করবেন। কখনও হয়তো রূঢ় কথা বলেছি। আমার দুটো গাড়ি ট্যাক্সি হিসেবে ভাড়া খাটে, সেই একটা গাড়ি নিয়ে আপনার ধরমপত্নী বালাসোর চলে গিয়েছিল, সে কথা আপনাকে বলিনি। বললেও কোনও সুবিধা হত না, তবু মাপ করবেন—

মেঘুদা চমকে উঠে বলল, অ্যাঁ? ভূষণবাবু জানত? কার সঙ্গে তিনি চলে গেলেন?

চুনিলালবাবু অধীরভাবে বাঁ হাত নেড়ে বললেন, ও কিছু না। ও কিছু না। ও নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাই না। যার যাবার সে চলে যাবে। কেউ কি জোর করে আটকে রাখতে পারে? ও কিছু না

থেমে গিয়ে, রহস্যময়ভাবে হেসে, চুনিলালবাবু আবার বললেন, আমি এই সুযোগ নিলাম, বুঝলেন? আমি ভূষণ চৌধারির বুকে হাত রেখে বললাম, ভূষণবাবু, এসব কী ভাবছেন। আপনি মরবেন কেন? আপনার এমন কী বয়েস, এখনও অনেক দিন বাঁচতে পারেন। ভগবানকে ডাকুন। ভূষণবাবু বললেন, আর ভগবানকে ডেকে কোনও লাভ হবে না, এবার ভগবানই আমাকে ডেকেছেন। আমি বললাম, ভগবানের কাছে সময় চাইলে তিনি সময় দেন। ভাল কাজ করার জন্য সময় দেন। আপনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলুন, আপনি সারা জীবনে যত গাছ কেটেছেন, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাবেন। এখন থেকে গাছ কাটা বন্ধ করে গাছ লাগাবেন। আপনাকে আমি সে দিন বলেছিলাম কিনা। গাছ কাটলে অভিশাপ লাগে। এটা আমার নিজের কথা নয়। সাহেবরা এই নিয়ে বড় বড় ইংরেজি কেতাব লিখেছে। ক্যালবার্টসান নামে খুব নাম করা এক সায়েন্টিস্ট লিখেছেন। যে মানুষ অনবরত গাছ কাটে, গাছের অভিশাপে তার আয়ু কমে যায়। আবার গাছ লাগালে তার

শুদ্ধি হয়।

আমি বললুম, ক্যালবার্টসান তো তাস খেলার বই লিখেছেন। ওই নামে কোনও বৈজ্ঞানিক আছেন, এমন তো শুনিনি ?

চুনিলালবাবু বললেন, ওই একটা নাম মনে এল, বলে দিলাম। তারপর আরও কী মজা হল শুনুন। আমি ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তার সাহেব, আপনি ওই বই নিশ্চয়ই পড়েছেন ? ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, জরুর পড়েছি। খুব ফেমাস বই। গাছ যারা কাটে, কোনও দাবাইতেই তাদের অসুখ সারে না ! আরও দু'-তিনজন বলল, ঠিক ঠিক। এ দেশের দস্তুর কী জানেন, কোনও ইংলিশ বইয়ের নাম করলেই অনেকে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমরাও পড়েছি। আমার মতন একজন বেহুদা যে বই পড়েছে, সে বই ওরা পড়েনি, তা কি হতে পারে ? সবার সামনে সে কথা স্বীকার করলে যে মূর্খ বনে যাবে। আমাকে আর বেশি কিছু কথা বলতে হল না। অন্যরাই বলতে লাগল, গাছ কাটার কত দোষ। কত পাপ হয়। ভূষণবাবু সবার কথা শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন। একবার ডাক্তারের মুখের দিকে, একবার আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। আমি মোক্ষম শেষ কথা বলে দিলাম, আজ থেকেই গাছ কাটা বন্ধ করে, নতুন গাছ লাগাবার হুকুম দিল, দেখুন ফল হয় কি না। ব্যস !

তক্ষুনি পরেশ সান্যালবাবুকে ডেকে পাঠানো হল। ভূষণবাবু বললেন, আমার যত টাকা লোকসান যায় যাক, আজ থেকে গাছ কাটার কারবার বন্ধ। জঙ্গল থেকে তাঁবু তুলে আনো। জামসেদপুরের নার্সারি থেকে গাছের চারা এনে লাগাবার বন্দোবস্ত করো। রংমতী এসে সোরগোল করার চেষ্টা করছিল, ডাক্তারবাবু নিজে তাকে বললেন, আরে চুপ চুপ। এখন যত বেশি ও কথা বলবে, তত পাপ বেড়ে যাবে। ভূষণবাবু কোনওদিন মেয়েকে বকাবকি করেন না, বেশি আদর দিয়ে মাথা খেয়েছেন, আজ নিজের মৃত্যুভয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, হারামজাদি, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোকে তালা বন্ধ করে রাখব !

চুনিলালবাবু আর একখানা বিড়ি ধরিয়ে ফেললেন।

মেঘুদা বলল, আপনি মশাই এতগুলো মিথ্যে কথা বলে এলেন ? এবার ভূষণ যদি দু'-একদিনের মধ্যেই মারা যায় ?

চুনিলালবাবু বললেন, এ মিথ্যে কথায় কি কারুর ক্ষতি হয় ! গাছকে মারলে মানুষ বাঁচে না, এ কথাটা কি পুরোপুরি মিথ্যে ? ভূষণবাবু যদি এর পরেও মারা যান তা হলে সবাই বলবে, ওর পাপের ভারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আর শুদ্ধি হল না। আর যদি কোনওক্রমে বেঁচে যান ? ওর

ওষুধ খাওয়া তো বন্ধ করতে বলিনি।

আমি বললুম, পাতাপাহাড়ী জঙ্গলের স্বার্থে এখন ভূষণ চৌধারিকে বাঁচিয়ে রাখাই দরকার !

চুনিলালবাবু বললেন, মশাই, সাহেবরা এ বিষয়ে বই লিখুক বা না লিখুক, এ দেশের মানুষও যে কেউ কেউ গাছপালা নিয়ে কত চিন্তা করে, তারও প্রমাণ পেলাম। ওখানে গঙ্গাধর কবিরাজ বসেছিলেন, অনেক বয়েস হয়েছে, একমাত্র তিনিই বললেন, চুনিলাল, আমি তোমার ওই আংরেজের লেখা বই পড়িনি, কিন্তু আমি জীবনে কখনও কোনও গাছ থেকে একটা ফুলও ছিঁড়িনি। বচপন থেকেই গাছেরা আমার সঙ্গে কথা বলে। আমি হর রোজ ঘুম থেকে উঠে, মন্দিরে যাবার আগে আমার বাড়ির পিছনে একটা কদমগাছের তলায় এক ঘণ্টা বসে ধেয়ান করি। শুধু ওই কদমগাছ নয়, আরও অন্য অন্য গাছের মনের কথা আমার মাথার মধ্যে টের পাই। সেই জন্য সারা দিন আমার ভাল যায়।

মেঘুদা বলল, গাছের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারটা কোনও কোনও সাহেবও লিখেছে। কেউ কেউ পারে, সবাই পারে না।

চুনিলালবাবু বললেন, গঙ্গাধর কবিরাজের কাছেই শুনলাম, গ্রামদেশের যে-সব মানুষ জঙ্গলে গাছ কাটতে যায়, কাঠ-চেরাইয়ের কাজ করে, তারা কেউ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বেশি বাঁচে না। আর যে-সব লোক প্রতিদিন সকালে গাছে জল দেয়, তারা অনেক বুড়ো বয়েস পর্যন্ত বাঁচে। ভূষণ চৌধারির বয়েস এখন ঠিক উনপঞ্চাশ।

মেঘুদা হাঁক দিয়ে বললেন, রণছোড়, রণছোড়, বিজলি করাত দুটো চৌধারিবাবুর বাড়িতে ফেরত দিয়ে আয় !

চুনিলালবাবু বললেন, খানিকটা জঙ্গলের পথ দিয়ে আমি এলাম। এর মধ্যেই গাছেরা ঠিক খবর পেয়ে গেছে। মনে হল, সব গাছের পাতারা খুশিতে হাসাহাসি করছে। সত্যি, বিশ্বাস করুন। চলুন না, দেখে আসবেন।

মেঘুদা বলল, আমার যে এখন একবার বেরুনো দরকার। অফিসে গিয়ে দু'-একটা চিঠিপত্র লিখতে হবে।

আমি বললুম, সেসব কাজ পরে লিখলে চলবে না ? চল, চল, একটু ঘুরে আসি। সাইকেল কিংবা জিপ নেবার দরকার নেই, পায়ে হেঁটে ঘুরব।

চুনিলালবাবু বললেন, দিনের বেলা বন্দুক নেবারই বা দরকার কী !

মেঘুদা খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়ে গেল।

এই সময় রোদ্দুরের তাপ বাড়তে থাকে, তবে জঙ্গলের মধ্যে ছায়ায়

ছায়ায় অতটা গরম লাগে না। আজ ভোর থেকেই বেশ আমেজমাখা হাওয়া দিচ্ছে। গাছ-কাটা বন্ধ হবার খবর সব গাছ টের পেয়ে গেছে কি না জানি না। সে রকম কোনও পরিবর্তন অবশ্য আমাদের চোখে পড়ল না।

দিনের বেলা পায়ে হেঁটে ঘুরতেই ভাল লাগে। রাত্তিরে একটু গা ছমছম করে, বিশেষত সাপের ভয় থাকে, এর মধ্যে এক দিন একটা সাপ দেখাও হয়ে গেছে। আমাদের কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই, এমনিই হাঁটছি, ঝোপঝাড় এড়িয়ে।

আজ সকাল থেকেই সব কিছু অন্য রকম লাগছে। চুনিলালবাবুও যেন অন্য মানুষ। তিনি এমনই উচ্ছ্বসিত হয়ে আছেন, যেন রাজ্য জয় করে এসেছেন। অবশ্য সত্যিই তাঁকে কৃতিত্ব দিতে হয়, ভূষণ চৌধারির মতন লোককে পাপের ভয় দেখিয়ে তিনি গাছ-কাটার কারবার বন্ধ করিয়েছেন। যুক্তি দিয়ে বোঝানো যেত না, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে কাজ হয়েছে।

তবে মুশকিল হল এই, চুনিলালবাবু আমাদের বোঝাবেনই যে গাছেরা ওই খবর পেয়ে খুশির আদান-প্রদান করছে। কয়েক পা গিয়েই তিনি বলেন, ওই যে দেখুন দেখুন, শালগাছের ডগার কাছে ঢলে পড়েছে একটা গুলমোহরের ডাল, মনে হচ্ছে না, ওরা গল্প করছে হাসতে হাসতে?

আমি বললুম, হাওয়া না দিলে কিন্তু গাছের একটা পাতাও নড়ত না।

চুনিলালবাবু বললেন, কী করে জানলেন যে হাওয়াও ওদের বন্ধু নয়? আজ এই জন্যই হাওয়া বইছে হয়তো। ঝড় উঠলে গাছের ডাল দারুণভাবে দোলে, মনে হয় যেন নাচানাচি করছে। এমনও তো হতে পারে, একটা নাচের উৎসব করার জন্য গাছেরা ঝড়কে ডেকে আনে?

আমি বললুম, মেঘুদা, তুমি চুনিলালবাবুকে কী মন্ত্রই দিয়েছ, কয়েক দিনের মধ্যেই বৃক্ষপ্রেমী হয়ে উঠেছেন, এমন দেখা যায় না!

চুনিলালবাবু বললেন, মেঘুবাবু, আপনি তো বলেছেন, যন্ত্রপাতি লাগিয়ে গাছের অনুভূতি, তাদের আনন্দ কিংবা ভয় পাওয়াটাওয়া বোঝা যায়। ভবিষ্যতে আরও উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি বেরুতে পারে, যাতে আমরা গাছের কথা শুনতে পাব। গাছের যন্ত্রণা টের পাব। আমাদের কোনও বিপদ হলে গাছের সঙ্গে পরামর্শ করব। এমন হতে পারে না?

মেঘুদা বলল, হ্যাঁ, হতে তো পারেই। অসম্ভব কিছু না।

চুনিলালবাবু বললেন, তা হলে তখন কেউ গাছের গায়ে একটা কোপ মারার পর সেই গাছটার যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠার শব্দ শুনতে পাবে। তা হলে নিশ্চয়ই আর দ্বিতীয়বার মারবে না। গাছ যে মানুষেরই মতন

জীবন্ত—

আমি বললুম, চুনিলালবাবু, মানুষকে মারলেও তো মানুষ যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে, তবু মানুষ মানুষকে মারে। কত মানুষ দুঃখে রয়েছে দেখেও মানুষ তাদের দুঃখ দেয়।

চুনিলালবাবুর মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, নীলুভাই, কেন ও কথাটা এখন বললে? মানুষের নিষ্ঠুরতার কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না!

আমি অনুতপ্তভাবে বললুম, আমার ভুল হয়ে গেছে। মাপ করে দিন। সব কিছুরই দুটো দিক আছে। মানুষ যেমন নিষ্ঠুর হয়, তেমনি মানুষ তো ভালবাসতেও জানে। কত মানুষ ভালবাসার জন্য জীবন দিয়ে দেয়। আমার মনে হয়, ভালবাসাই মানুষের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

মেঘুদা বলল, নিউটনও অনেকটা এই কথা বলে গেছেন, নিউটনের জীবনী পড়েছিস? অত বড় সায়েন্টিস্ট, সারা জীবন বিজ্ঞানের সাধনা করে গেলেন, মেয়েদের নিয়ে মাথা ঘামাননি। মৃত্যুর ঠিক আগে, খানিকটা আফসোসের সঙ্গেই বলেছিলেন, এখন বুঝতে পারছি, ভালবাসাই মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় সম্পদ।

চুনিলালবাবু বললেন, জীবনে একবার অন্তত ভালবাসার অভিজ্ঞতা যার হয়নি, সে বড় হতভাগ্য। আমার সে আফসোস নেই। একজন আমাকে ভালবেসেছিল, আমার জন্য সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছিল, আমিও তার জন্য সব কিছু ছাড়তে পেরেছি, এও কি কম কথা?

এরপর খানিকক্ষণ আমরা নীরব রইলাম। হয়তো তিনজনের চিন্তা ছুটল তিন দিকে।

দিনের বেলা জন্তুজানোয়ার প্রায় দেখাই যায় না। খরগোশগুলোও কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। পাখি চোখে পড়ে নানা রকম। আজকাল ফসলের খেতে পোকা মারার বিষ ব্যবহার করার জন্য পাখিও কমে যাচ্ছে খুব। বিষাক্ত পোকা খেয়ে পাখিরা মরে যায়। জঙ্গল তবু পাখিদের আশ্রয়। টিয়া আর হরিয়ালের ঝাঁকই বেশি, দূর থেকে ময়ূরের ডাক শুনেছি, এখনও একটাও চোখে পড়েনি।

কোথায় যেন একটা চোখ-গেল পাখি অশ্রান্তভাবে ডেকে চলেছে।

হঠাৎ পাহাড়ি নদীটি দেখে আমি বেশ অবাক হলুম। আমরা মাত্র মিনিট পঁয়তাল্লিশেক হেঁটেছি। আগের দিন মনে হয়েছিল, ওই নদীটা জঙ্গলের অনেক গভীরে।

মেঘুদা বলল, জিপে আসতে গেলে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হয়।

এখান থেকে ওয়াচ টাওয়ারটাও কাছেই।

চুনিলালবাবু বললেন, চলুন না, একবার ভোলানাথকে দেখে আসি। কাল ওর কাহিনীটা শুনে বারবার ওর কথা মনে পড়েছে।

মেঘুদা বলল, সারা বছর আলু আর শাকসব্জি খায়, ওদের জন্য খানিকটা চাল আনলে বেশ হত।

চুনিলালবাবু বললেন, আমার কাছে চল্লিশ টাকা আছে। কালকেই আমি ওদের জন্য পাঁচ কে জি চাল কিনে আনব।

মেঘুদা বলল, ফরেস্ট গার্ড হরিদাসকে ডাকি বরং। ভোলানাথের বউ ধানিয়া এমন ঠেট হিন্দি বলে যে আমিও সব বুঝতে পারি না। ও বুঝবে।

আমি বললুম, ভোলানাথের বউ? বিয়ে হয়েছে নাকি?

মেঘুদা হেসে বলল, মন্ত্র পড়া লাগে না। এক সঙ্গে থাকলেই বউ। জঙ্গলের মধ্যে তো সমাজ নেই। ইউরোপ-আমেরিকায় এখন লিভিং টুগেদার নিয়ে কত লেখালেখি হয়, এ সব জায়গায় ওসব কবে থেকেই চালু হয়ে আছে!

চুনিলালবাবু আর আমি দাঁড়িয়ে রইলুম নদীর ধারে। মেঘুদা এগিয়ে গিয়ে ওয়াচ টাওয়ার থেকে হরিদাস দাসকে ডেকে আনল।

আজও একইরকম ভাবে ভোলানাথ আলু খেতে বসে একটা কঞ্চি দিয়ে মাটি খোঁচাচ্ছে, ধানিয়া নামে অ্যালবিনো রমণীটি কুঁড়েঘরের দরজার বাইরে একটা পাথর-সাজানো উনুনে মাটির হাঁড়িতে কী যেন রান্না চাপিয়েছে।

মেঘুদা বলল, দাস, তুমি ওদের বুঝিয়ে বলো, আজ ওদের হরিণ মারার জন্য বকাবকি করতে আসিনি। ওদের কোনও ভয় নেই। এমনই দু'চারটে কথা বলব।

আমাদের আগে মেঘুদাই মাটির ওপর বসে পড়ল। এখানে জামা প্যান্টে ধুলো লাগল কি না লাগল, তাতে কে মাথা ঘামায়! শহুরে তেল-কালি মাখা ধুলো তো নয়, ভাল করে ঝাড়লেই উঠে যায়।

হরিদাস ধানিয়াকে ডেকে আনল আমাদের কাছে।

ভোলানাথ মুখ ঘুরিয়ে বারবার আমাদের দেখল। আমার চোখে দু'-এক পলক স্থির রাখল দৃষ্টি। আমাকে চিনতে পারল কি না বোঝা গেল না।

ধানিয়ার সঙ্গে মেঘুদার যে সংলাপ চলতে লাগল, তা অনেকটাই বুঝতে আমাদের অসুবিধে হল না, হরিদাস দু'-চারটে দুর্বোধ্য উৎপ্রেক্ষা শুধু বুঝিয়ে দিতে লাগল মাঝে মাঝে।

মেঘুদা বলল, শোনো, আমি সরকারের লোক, তোমরা যদি বেআইনিভাবে গাছ না কাটো আর হরিণ না মারো, তা হলে তোমাদের এখান থেকে চলে যেতে বলব না। যেমন আছো, তেমনি থাকবে।

ধানিয়া বেশ সপ্রতিভভাবেই বলল, সাহেব, কালই তোমাকে বলেছি, আমরা মাছ মাংস খাই না। আমি গন্ধই সহ্য করতে পারি না। সুতরাং হরিণ মারব কেন? ভগবানের প্রাণী, তাকে মারা ঠিক নয়। আর শুকনো ডালপাতা আমি কুড়িয়ে আনি জ্বালানির জন্য। আমাদের বেশি কিছু লাগে না। আমাদের ঘরে একটা টাঙ্গিও নেই, গাছ কাটব কী করে!

সংরক্ষিত জঙ্গল থেকে বিক্রির জন্য গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া আইনত দণ্ডনীয়। কিন্তু জঙ্গলের অধিবাসী কিংবা কাছাকাছি গ্রামের লোকরা নিজেদের মাথায় যতটুকু বোঝা নিতে পারে, ততখানি শুকনো ডাল পালা যদি নিয়ে যায়, তা আইনসম্মত। সরকার গরিব লোকদের সে অধিকারটুকু দিয়েছে।

ভোলানাথ-ধানিয়ার ছোট্ট সংসারটুকু দেখে বোঝা যায়, ওদের তার বেশি লাগেও না।

মেঘুদা জিজ্ঞেস করল, তোমাদের এখানে থাকতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

ধানিয়া সরল বিস্ময়ে বলল, অসুবিধে কী হবে সাহেব! কেউ তো আমাদের মারতে আসে না।

মেঘুদা বলল, তুমি কত বছর আগে এখানে এসেছ?

ধানিয়া বলল, তা তো মনে নেই। তিন বরষ, চার বরষ, পাঁচ বরষ হবে!

মেঘুদা বলল, এটা এখন কোন সাল তুমি জানো?

ধানিয়া ফিক করে হেসে লাজুকভাবে দু'দিকে মাথা দোলাল।

মেঘুদা আমাদের দিকে ফিরে বলল, ক্যালেন্ডার-ফ্যালেন্ডার এসব ফালতু জিনিস, বুঝলি! বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে, অনেক মানুষ তা গ্রাহ্যই করে না।

আমি বললুম, মেঘুদা, জিজ্ঞেস করো তো, ভোলানাথের সঙ্গে ওর কী করে দেখা হল?

ধানিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উদাসীন গলায় বলল, আমায় কেউ চায় না। ভগবান আমায় এমনভাবে গড়েছেন, সেটা কি আমার দোষ? আমায় সবাই ঢিলা মারত। সবাই ডাইনি বলত! পরম আত্মা জানেন, আমি কোনওদিন কারুর ক্ষতি চাইনি। তবু বাঁচার জন্য আমাকে জঙ্গলে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

মেঘুদা জিজ্ঞেস করল, তোমার গায়ের রং তো মেম সাহেবদের মতন। তুমি বিধবা হবার পর আর কোনও মরদ তোমাকে শাদি করতে চায়নি ?

ধানিয়া বলল, না সাহেব। সবাই আমাকে বলত প্রেতিনী, আমি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মাংস চিবিয়ে খাই। হায় ভগওয়ান, আমি জীবনে কখনও পাঁঠার মাংসও খাইনি। দেখলেই আমার বমি আসে।

মেঘুদা বলল, তারপর ?

ধানিয়া বলল, এই জঙ্গলে এসে বেঁচে গেলাম, সাহেব। ছাতু টুকিয়ে খেতাম। ঘাস-পাতা খেতাম। তাতেও শান্তি ছিল। একদিন নদীর কিনারে দেখি যে কুদরু ফলে আছে, অনেক, অনেক। কুদরু খেয়েই তো পেট ভরে যায়। খুব বরষা নামল। নিজে এই কুঁড়েঘরটা বানিয়েছি। বড় শান্তি, বড় শান্তি। কেউ আমায় আর মারে না। ভেবেছিলাম, মার খেতে খেতেই জীবনটা যাবে।

কুদরু অনেকটা পটলের মতন। বিহারের অনেক জায়গায় খেয়েছি। এখানে এসে অবশ্য আমি কুদরু দেখিনি। আজই চিখরিয়াকে বলতে হবে তো, কুদরু জোগাড় করে আনতে।

ধানিয়া আবার বলল, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল। তারপর শীত এল। সেই সময়টা বড় কষ্ট হত! রাতে ঘুম আসত না। একটা মরদ না থাকলে মেয়েমানুষ কি একলা বাঁচতে পারে ? আমি কেঁদে কেঁদে বলতাম, হে ভগওয়ান, আমি কী দোষ করেছি, কেন আর পাঁচটা মেয়ের মতন আমার গায়ের রং কালো করে দিলে না ? কেন পুরুষরা আমাকে দেখে ভয় পায় ? তারপর এক দিন আমি ওই লোকটাকে দেখি।

ধানিয়া হাত দিয়ে ভোলানাথকে দেখিয়ে দিল। আমরা সবাই সেদিকে তাকালুম। সে আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসে আছে। সে আমাদের উপস্থিতির কথা জানে অবশ্যই। কিন্তু কোনও কথা বলবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে আছে।

আমি ধানিয়াকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি যখন ওর কাছে প্রথম যাও, তখন ও তোমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি ?

ধানিয়া বলল, খারাপ ব্যবহার কী, তা ও জানেই না হুজুর। আমি ওকে প্রথম দেখি, ও একটা বড় গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে। মাথার ওপর ছাউনি নেই, ঘর-গেরস্থি কিছু নেই, কী খায় তা কে জানে, দিনের পর দিন ওই একই জায়গায় বসে থাকে। আমার মন বড় আনচান করত। মানুষটা মরে যাবে নাকি ? এক দিন খুব জারা ছিল,

শীতকালেও বৃষ্টি পড়ছিল, আমি ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, ওই মানুষটা কি এখনও গাছতলায় বসে আছে ? যত ভাবি, ততই উতলা লাগে। এই শীতের বৃষ্টির মধ্যে একটা মানুষ গাছতলায় থাকলে যে মরে যাবে। কী জানি, ভগবানই বোধ হয় আমাকে পাঠাল। আমি ছুটে ছুটে গেলাম, লোকটার হাত ধরে বললাম, চল, আমার সঙ্গে ঘরে চল। অমনি চলে এল। আমি গরম পানি তৈয়ার করে ওর হাত-পা ধুয়ে দিলাম। ততদিনে আমি আলু চাষ শুরু করেছি। আলুর মণ্ড খাওয়ালাম, খেয়ে নিল। তারপর থেকে, ও আমার মরদ। বড় পেয়ার করে আমাকে।

চুনিলালবাবু বললেন, নীলুভাই, তুমি যা বলেছিলে, সেই রোগটা তা হলে ওর একেবারে সেরে গেছে!

আমি নিম্নস্বরে বাংলায় বললুম, তাই তো দেখা যাচ্ছে, ওই রোগের জন্যই ওকে শহরে রাখা যায়নি। জঙ্গলে কিছুদিন থাকলে মানুষের অনেক অসুখ সেরে যায়, এটা আমিও বিশ্বাস করি।

ধানিয়া আবিষ্টভাবে বলল, ও মরদটা এত ভাল, কোনওদিন আমার গায়ে হাত তোলেনি, একবারও গলা চড়িয়ে বকেনি। কখনও আমার পিঠে দরদ হলে ও আমার পিঠ ঘষে দেয়। নদী থেকে পানি তুলে নিয়ে আসে। একবার আমার বোখার হল, কী জানি কোথা থেকে ও আমাকে দুধ এনে খাওয়াল। বড় মসুর আদমি, সাহেব, ভোলাভালা হলে কী হবে, বিপদের সময় সব খেয়াল থাকে। তবে, ঘরের থেকে গাছের তলায় থাকতে বেশি ভালবাসে। মাঝে মাঝে দু'-দিন এক দিনের জন্য কোথায় চলে যায়, আমি কিছু বলি না, জানি ঠিক ফিরে আসবে। ফিরে আসে, এসে আমার পাশে এসে বসে থাকে চুপ করে। কখনও আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আপন মনে গান গায়।

এই সময় ভোলানাথ উঠে এল আমাদের দিকে। আমরা সবাই একটু সন্ত্রস্ত বোধ করলুম। লোকটি যে নিরীহ তা বোঝা গেছে, তার চোখের দৃষ্টি খুবই শান্ত ও সমাহিত, কিন্তু একজন মানুষ আগাগোড়া নিঃশব্দ থাকলে তাকে দুর্বোধ্য মনে হবেই।

ভোলানাথ আমাদের অগ্রাহ্য করে ধানিয়ার দিকে হাত বাড়াতেই ধানিয়া তার ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ির মতন চুটিয়া বার করে দিল। ভোলানাথের আগেও সিগারেটের নেশা ছিল। ধানিয়া সেই চুটিয়া ধরাবার জন্য উনুন থেকে আগুন আনতে যাবার উদ্যোগ করতেই আমি ফস্ করে একটা লাইটার জ্বেলে দিলুম তার সামনে।

তারপর বললুম, ভোলানাথ, তুমি লাইটারটা নেবে ? আমায় চিনতে পারছ না, আমি নীললোহিত।

ভোলানাথ যেন আমার কথা শুনতেই পেল না।

ধানিয়া খানিকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে ব্যাকুলভাবে বলল, সাহেব, ও কিন্তু মাঝে মাঝে কথা বলে। পড়ালিখা আদমির মতন কথা বলে। পাঁচ-ছ' দিন ধরে ওর খুব মন খারাপ। কী হয়েছে জানি না। আমার সঙ্গেও বাত্‌চিত করছে না। সাহেব, আমি ওর হয়ে মাফি মেঙে নিচ্ছি।

মেঘুদা বলল, আরে, তুমি এত ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ কেন ? কথা বলেনি তো কী হয়েছে। আমারও মাঝে মাঝে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

চুনিলালবাবু বললেন, ধানিয়া, তোমাদের দেখে বড় শান্তি হল। তোমাদের জীবনে কোনও অভাব নেই, তাই না ? আমি যদি তোমাদের কাছে এসে থাকতে চাই, তোমরা থাকতে দেবে ?

ধানিয়া আবার লাজুকভাবে হেসে ফেলে বলল, কী যে বলেন সাহেব, আপনারা রাজা লোক। আপনারা কেন এই জঙ্গলে এসে থাকতে যাবেন ? আমাদের যে মারতে মারতে ভাগিয়ে দিল। না ভাগিয়ে দিলে কি আসতাম ?

আমি দূরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, ভোলানাথ নদীটায় নেমে গিয়ে মাঝখানের একটা বড় পাথরের ওপরে দাঁড়াল। খুব কাছেই রয়েছে গোটা পাঁচেক ধপধপে সাদা বক। ভোলানাথকে কাছাকাছি দেখেও তারা সরে গেল না। ওই বকেরা কি ভোলনাথকে একটা মানুষ হিসেবেও ভয় পায় না ?

॥ নয় ॥

এই দম্পতিটিকে দেখে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছেন চুনিলালবাবু। ফেরার পথে বারবার ওদের কথাই বলতে লাগলেন। একটা কথা বলে ধানিয়া অবশ্য আমাকে আর মেঘুদাকেও অভিভূত করে দিয়েছে।

আমরা যখন ওঠার উদ্যোগ করছিলুম, তখন ধানিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলল, হুজুররা এসেছেন। আপনাদের কী দিয়ে সেবা করব ? গ্রামের বাড়ি যদি হত, অতিথিকে কিছু না-কিছু ভোজন না করালে পাপ হত। আমি হতভাগিনী, জঙ্গলে পড়ে আছি, আমাদের কিছুই নেই। কী দেব ! অতিথি নারায়ণ ফিরে যাবে ! দুটো আলু পুড়িয়েছি। একটু মুখে দিয়ে আমাদের ধন্য করবেন কি ? অবশ্য আপনারা উঁচু জাত, আমার হাতের ছোঁয়া বুঝি খাবেন না।

আমি স্তম্ভিতভাবে মেঘুদার দিকে তাকিয়ে ছিলুম। দারিদ্র্যসীমার

সবচেয়ে নীচে এদের অবস্থান। কোনও রকম প্রোটিন দূরের কথা, ভাত-রুটি খাবারও সামর্থ্য নেই, তেমন গরিবও নিজেদের সামান্য খাবারের ভাগ দিয়ে অতিথিসেবা করতে চায় ! এই ধানিয়া, যাকে মানুষের সমাজ ডাইনি বলে মারতে মারতে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেও ভারতীয় নারীর আদর্শ ছাড়তে পারেনি।

চুনিলালবাবু বলে উঠেছিলেন, না, না, হাতের ছোঁয়ার জন্য নয়, তোমাদের খাবারে আমরা ভাগ বসাব কেন ? আর এক দিন, আমরা আর এক দিন এখানে এসে সবাই মিলে রান্না করব

মেঘুদা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, না, আমি খাব। কই নিয়ে এসো তো তোমার আলু ! আমার একটু খিদেও পেয়েছে।

ধানিয়া দৌড়ে গিয়ে গোটা পাঁচেক ছাই মাখা আলু নিয়ে এল। খানিক আগে পুড়িয়েছে, এখনও গরম আছে।

মেঘুদা খানিকটা ভেঙে নিয়ে মুখে পুরে বলল, আমরা আলু সেদ্ধ খাই, এ খোসাসুদ্ধ পুড়িয়েছে। খেয়ে দেখ, বেশ ভাল স্বাদ। সাহেবরাও অনেক সময় ভাতের বদলে শুধু আলু খায়।

নুনের সঙ্গে খানিকটা কাঁচালঙ্কা বাটা, তাই দিয়ে সেই খোসাসুদ্ধ পোড়া আলু খেতে ভালই লাগল। আলু সেদ্ধর চেয়ে পোড়া আলু আরও ভাল, আমরা খাই না কেন ? আলুভাজার চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যকরও বটে।

ধানিয়া আমাদের খাওয়ার দিকে এমন মুগ্ধভাবে তাকিয়েছিল, যেন সে একেবারে ধন্য হয়ে যাচ্ছে।

মেঘুদাই টপাটপ বেশি আলু শেষ করে ফেলে বলেছিল, বহিন, এবার একটু জল খাওয়াও !

ভিখিরিরও কিছু সম্পত্তি থাকে। এদেরও আর কিছু না থাক টিনের গেলাস আছে। সেই গেলাসে জল এনে দিল ধানিয়া। নিশ্চয়ই নদীর জল। স্বাস্থ্যবাতিকে আমরা এই ধরনের জল খাই না। মেঘুদা অম্লানবদনে খেয়ে নিল। অচ্ছুতের হাত থেকে জল পান করাই শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি জানানো। শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেলেছিল ধানিয়া।

হাঁটতে হাঁটতে চুনিলালবাবু বললেন, আপনি পারলেন, মেঘুবাবু, জলটা খেতে আমার বাধো বাধো লাগছিল। আপনি শুধু গাছপালাকে ভালবাসেন না, মানুষকেও ভালবাসেন।

মেঘুদা বলল, নাঃ ! সব মানুষকে ভালবাসতে পারি না !

আমার মাথায় একটা অন্য কথা ঘুরছিল। ভোলানাথ অন্য সময়ে কথা বলে, এখন তার মন খারাপ বলে ক'দিন কথা বন্ধ আছে। কেন তার মন খারাপ ? ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলে আরও অনেক কিছু

জানা যেত।

আমি বললুম, মেঘুদা, চুনিলালবাবু, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। সেদিন রাত্তিরে আলবেলি ঝাপটার কাছে যাকে দেখেছিলুম, সে এই ভোলানাথ নয় তো ?

দু'জনে এক সঙ্গে বলে উঠল, না, না।

আমি বললুম, যাকে দেখেছি, সে মানুষ নিশ্চয়ই। আর কে হবে ? কোনও চোর-ডাকাত হলে আমাদের দিকেই ছুটে আসত না।

মেঘুদা বলল, আমার হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে গেল কেন ? ভয়ে ? আমি মেঘনাদ ঘোষাল একটা মানুষকে দেখে অত ভয় পাব ?

চুনিলালবাবু বললেন, ভাল করে মুখ দেখতে পাইনি, কিন্তু সে আরও বেশি লম্বা ছিল না ? তার চোখ দুটো জ্বলছিল দৈত্যের মতন।

আমি বললুম, না, চুনিলালবাবু, তার চোখটোখ জ্বলেনি। আমিও অবশ্য তার মুখটা ভাল করে দেখতে পাইনি অন্ধকারে। ভোলানাথ হতেও পারে। সে আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি।

মেঘুদা বলল, নীলু, তোর সেই কাঁপুনির কথা মনে আছে ? সেটা শীতের কাঁপুনি নয়। ভয়েরও নয়। ইলেকট্রিক শকের মতন। সেদিন যাকে দেখেছি সে কোনও সাধারণ মানুষ হতে পারে না। আমি মরে গেলেও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করব না। কিন্তু এমন কিছু কিছু রহস্যময় ব্যাপার এখনও আছে, যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানও জানে না, এটা আমি মানি।

চুনিলালবাবু দু' দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, সে প্রাণীটা ভোলানাথ হতে পারে না। ভোলানাথের অত শান্ত চোখ, যেন সন্ন্যাসী। আর সেই মানুষের মত প্রাণীটার চোখ জ্বলছিল, আমি হলফ করে বলতে পারি। আমরা চারজন ছিলাম, তবু তাকে বাধা দেবার শক্তি আমাদের ছিল না।

এই ব্যাপারে তখন আমাদের মতের মিল না হলেও মীমাংসা হয়ে গেল রাত্তিরবেলা।

ভোরবেলা থেকেই দেখেছি, আজ সব কিছু অন্য রকম, রাত্তিরেও তার রেশ রয়ে গেল।

দিনেরবেলা অনেক হাঁটাহাঁটি হয়েছে, রাত্তিরে আর বেরুবার ইচ্ছে ছিল না। চুনিলালবাবু নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁকে জোর করে ধরে রাখা হয়েছে। তিনজন না হলে ঠিক আড্ডা জমে না।

আমাদের চিখরিয়াকে সারা দিনই নীরব দেখছি। সে রণছোড়ের সঙ্গে একবারও ঝগড়া করেনি। বিকেলবেলা চা দেবার পর সে কোথায় যেন চলে গেছে। ডেকে ডেকেও তার পাত্তা পাওয়া যায়নি। চিখরিয়ার

আপনজন কেউ নেই। কলেরায় তার স্বামী মারা গেছে। দুই ছেলে চাকরির সন্ধানে চলে গেছে দূরের শহরে। এই বাংলোতেই চিখরিয়া রান্নার কাজ করে। পর পর রেঞ্জারবাবুরা আসে, আবার বদলি হয়ে চলে যায়, চিখরিয়া থেকে যায়। মেঘুদা অবশ্য বলেছে, ট্রান্সফার হয়ে গেলে সে চিখরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। সে আদর্শ অভিভাবিকা।

বারান্দায় বসে বেশ জমিয়ে আড্ডা হচ্ছিল, হঠাৎ কামান গর্জন হল। কামান নিশ্চয়ই নয়, মেঘ। তারপর একটু পরে আরও জোরে। কোথাও নিশ্চয়ই বজ্রপাত হল।

মেঘুদা মুখ ঝুঁকিয়ে আকাশ দেখে বিহ্বল গলায় বলল, আশ্চর্য ব্যাপার ! একটুও মেঘ দেখা যাচ্ছে না।

আমরাও বারান্দা ছেড়ে নীচে নেমে দাঁড়ালুম। একেবারে নির্মেঘ আকাশ। অনেক তারা দেখা যাচ্ছে, বেশ জ্যোৎস্না ফুটেছে।

মেঘুদা বলল, সেদিনকার মতন ব্যাপার। বিশেষ একটা জায়গায় শুধু মেঘ জমে বৃষ্টি নামবে ?

চুনিলালবাবু বললেন, এর আপনি কী ব্যাখ্যা দেবেন !

নিজের সঙ্গে নিজে তর্ক করার ভঙ্গিতে মেঘুদা শুধু দু'বার মাথা নাড়ল।

আরও একবার বজ্র নির্ঘোষ হল, এবার আমরা চড়াৎ করে বিদ্যুতের আলোও দেখতে পেলুম।

মেঘুদা বলল, একবার আলবেলি ঝাপটায় ঘুরে আসব নাকি ?

চুনিলালবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না, থাক। মাথায় বাজ পড়লে মারা যাব। লক্ষণ ভাল না। সত্যি বলছি মশাই, এরকম অসময়ে অলক্ষুণে মেঘের ডাক শুনলে আমার ভয় করে।

জঙ্গলের শুকনো পাতায় কার যেন পায়ে চলার শব্দ হল। কেউ এদিকেই আসছে। আমরা উদগ্রীবভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইলুম।

আলোছায়ার মধ্যে দেখা গেল একটা শাড়ি পরা মূর্তি। আস্তে আস্তে হাঁটছে। বুকের মধ্যেও একবার মেঘের ডাক অনুভব করলুম।

মেঘুদা গলা তুলে বলল, কে, কে ওখানে ? চিখরিয়া ?

সত্যিই তো, চিখরিয়াই। আগে কোনওদিন তাকে এমনভাবে জঙ্গলের মধ্যে পদচারণা করতে দেখিনি।

মেঘুদা জিজ্ঞেস করল, চিখরিয়া, জঙ্গলের মধ্যে কোথায় গিয়েছিলে ?

কাছে এসে চিখরিয়া একেবারে নিরুত্তাপ গলায় বলল, আমি জঙ্গলে যাই। ঘুরতে যাই। এক এক দিন ঘর ভাল লাগে না। ছেলে দুটোর কথা মনে পড়ে, তখন জঙ্গল ভাল লাগে।

মেঘুদা বলল, মেঘ ডাকছে। তুমি টর্চ নিয়ে যাওনি ?

চিখরিয়া বলল, আমার ডর লাগে না। অনেক দূরে চলে যাই। এই জঙ্গলে ভূত নেই। বনদেব্‌তা আছে। আমি বনদেব্‌তাকে দেখি, তিনি সবাইকে রক্ষা করেন। বনদেব্‌তা ঘুরে ঘুরে সব গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, গাছগুলো তাজা হয়ে যায়। তোমরা বনদেব্‌তাকে দেখবে ? আজ দেখাতে পারি।

মেঘুদা বলল, কোথায় ?

চিখরিয়া বলল, আলবেলি ঝাপটার কাছে বসে আছেন। গাছের পূজা করছেন।

মেঘুদা বলল, এখনও তিনি বসে থাকবেন নাকি ? এখনও গেলে দেখতে পাব ?

চুনিলালবাবু বললেন, না, না, এতক্ষণ থাকে নাকি ? সেদিন মেঘ বৃষ্টির পর আমরা ফিরে গেলাম না ? কিছুই ছিল না।

আমি বললুম, তবু একটা চান্স নেওয়া যাক। মেঘুদা, চলো চলো, একবার দেখে আসি।

মেঘুদা বলল, চুনিলালবাবু, আপনার যদি বাজ পড়ার ভয় থাকে, তা হলে আপনি এখানেই বসে থাকুন, আমরা দেখে এসে আপনাকে জানাচ্ছি।

চুনিলালবাবু দৌড়ে গিয়ে জিপ গাড়িতে চড়ে বসলেন।

রণছোড়, চিখরিয়াকেও তুলে নেওয়া হল। রাইফেলটা যথারীতি আমার কোলে। সঙ্গে তিনটে টর্চ।

জিপ বেশিদূর যায় না, সেখান থেকে নামবার পর আজ চিখরিয়া আমাদের পথ দেখাচ্ছে। রণছোড় একেবারে চুপ। সে আগের দিন আমাদের ভূত দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, আজ চিখরিয়া বনদেবতা দেখাবে। বনদেবতাকে দেখে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই, তিনি মানুষের ক্ষতি করেন না।

আলবেলি ঝাপটার যেদিকটায় গিয়েছিলুম আগের দিন, আজ এলুম তার উল্টোদিকে। বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমক সত্ত্বেও এখানে বৃষ্টি পড়েনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল, খানিকটা মেঘ জমেছিল বটে, দ্রুত সরে যাচ্ছে।

চিখরিয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ ! ওই তো বসে আছেন।

চিখরিয়া দেখতে পেলেও আমরা পাইনি। এক সঙ্গে তিনটে টর্চ জ্বলে উঠল। এবার দেখলুম, যেখানে বড় শিমুল গাছটা ছিল, সেখানে মানুষের মতন কেউ একজন বসে আছে। অস্পষ্ট, চাপা গলায় গানের সুরও

শুনতে পাওয়া গেল।

মেঘুদা বলল, নীলু, রাইফেলটা দে তো !

চুনিলালবাবু তার হাত চেপে ধরে বললেন, গুলি করবেন নাকি ? না, না, ও কাজ করবেন না, আগে দেখা যাক ভাল করে।

মেঘুদা বলল, গুলি করব না, কিন্তু রাইফেলটা সঙ্গে রাখতে দোষ কী ! আপনারা এখানেই দাঁড়ান, আমি এগিয়ে গিয়ে দেখছি, ব্যাপারটা কী।

আমি বললুম, মেঘুদা, একটা লোক যদি জঙ্গলে রাত্তিরবেলা বসে একা একা গান গায়, সেটা দোষের কিছু নয়।

চিখরিয়া বলল, লোক নয়, বনদেব্‌তা। কোনওদিন আমাদের ক্ষতি করেনি।

মেঘুদা বলল, যদি সত্যিই বনদেবতা হয়, তা হলে আমিও ওর ক্ষতি করব না। কিন্তু ঠিক ঠিক জানতে হবে তো !

মেঘুদা বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল।

আমাদের পক্ষেও কৌতূহল দমন করে দূরে থাকা সম্ভব নয়। আমরাও এগোতে লাগলুম যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে। মৃদু মৃদু বাতাস বইছে, ঝিলমিল করছে গাছের পাতা। মেঘ সরে গিয়ে ফিরে আসছে আকাশের নীলিমা। আর কিছু না হোক, এই মেঘটাকে ভুতুড়ে বলতেই হবে। এরকম হঠাৎ একটুখানি জায়গায় মেঘ জমা, আবার একটু বাদেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া, জীবনে কখনও দেখিনি।

এক জায়গায় গিয়ে মেঘুদা উঃ শব্দ করে উঠল, তারপর হুড়মুড় করে পিছিয়ে এল। দু' হাত ছড়িয়ে বলল, ব্যাস, এই পর্যন্ত। কেউ আর এগিয়ো না।

আমি মেঘুদার কাছে গিয়ে বললুম, কী হল ! কিছুতে লাগল ? কেউ কিছু ছুঁড়ে মেরেছে ?

মেঘুদা ফ্যাকাসে গলায় বলল, কেউ মারেনি। ইলেকট্রিক শকের মতন লাগল। আগের দিনের মতন। আজ বেশ জোরে।

আমি বললুম, জঙ্গলের মধ্যে, কোথাও ইলেকট্রিক তার নেই, কী করে শক লাগবে ?

মেঘুদা বলল, তা তো জানি না। তবু শক লেগেছে, এটা ঠিকই। মনে হচ্ছে, এখানে একটা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়ে গেছে। সেই রেডিয়াসের মধ্যে ঢুকলে শক লাগছে। বজ্রপাত-বিদ্যুতের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তাই বা কে জানে !

আমি বললুম, কিন্তু তা হলে ওই লোকটা বসে আছে কী করে ?

মেঘুদা বলল, তাও ঠিক বলতে পারব না। হয়তো ওর শক লাগে

না। কেউ কেউ বিদ্যুৎ সহ্য করতে পারে। কোনও কোনও মানুষ নাকি কিছুক্ষণের জন্য শরীরে বিদ্যুৎ ধরে রাখতে পারে। সেইজন্যই সেদিন এই লোকটা আমাকে ছুঁয়ে দেওয়ায় আমার হাত থেকে রাইফেলটা পড়ে গিয়েছিল।

চুনিলালবাবু বললেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মেঘুদা বলল, আপনাকে আমি বোঝাতেও পারব না। আমিই নিজেই সব বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে মেঘুদা বলল, নীলু, দেখ, দেখ, আলোটা দেখতে পাচ্ছিস ?

ছায়ামূর্তিটা দুলে দুলে টানা সুরে গান গেয়েই চলেছে। আমাদের টর্চের আলো, ফিসফাস কথাবার্তা সে গ্রাহ্য করছে না। আমাদের থেকে তার দূরত্ব প্রায় এক শো গজের মতন।

যেখানে শিমুল গাছের গুঁড়িটা কাটা হয়েছে, সেখানে প্রদীপের শিখার মতন একটা আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই আলোর রং নীলচে, ইলেকট্রিক স্পার্কের মতন।

এরকম ব্যাপার কখনও দেখিনি। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মেঘুদাকে জিজ্ঞেস করলুম, ওটা কী ? আলোটা আসছে কোথা থেকে ?

মেঘুদা বলল, জানি না। কী করে বলব !

চুনিলালবাবু আরও এগিয়ে দেখতে গিয়ে মেঘুদারই মতন উঃ শব্দ করে উঠলেন। ধড়ফড় করে পিছিয়ে এসে বললেন, কী হল ! কে আমায় ঝাঁকুনি দিল ?

মেঘুদা বলল, ওইটাই ইলেকট্রিক শক। বললাম না, আর এগোবেন না। কেউ আমাদের কাছে যেতে বারণ করছে।

চুনিলালবাবু বললেন, কে ?

মেঘুদা বলল, জানি না। এক কাজ করা যাক, আমরা এখানে বসে পড়ি। তারপর দেখা যাক কী হয়।

সাপখোপ আছে কি না তা টর্চের আলোয় ভাল করে দেখে নিয়ে সেখানে বসে পড়া গেল। আমার ভয় করছে না, একটা অনৈসর্গিক অনুভূতি হচ্ছে ঠিকই।

চুনিলালবাবু বিড়ি ধরালেন। তারপর নিজেই বললেন, এখানে কি বিড়ি খাওয়া ঠিক হবে ? চিখরিয়া ঠিকই বলেছিল, ওই লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন পুজোয় বসেছে।

আমি মেঘুদাকে জিজ্ঞেস করলুম, ইলেকট্রিক শক লাগছে, ইলেকট্রিক স্পার্কের মতন আলোও দেখতে পাচ্ছি, অথচ তার নেই, ব্যাটারি নেই,

জেনারেটর নেই, তবু এটা কী করে সম্ভব হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

মেঘুদা বলল, বুঝতে না পারলেও চোখের সামনে দেখতে তো পাচ্ছি আমরা। দেখ, বিদ্যুৎ কী ভাবে তৈরি হয়, বিদ্যুৎকে কত রকম কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে, এখনও গবেষণা চলছে। কিন্তু বিদ্যুৎ জিনিসটা ঠিক কী, তা কিন্তু এখনও কেউ জানে না।

চুনিলালবাবু বললেন, এই লোকটি শিমুলগাছের গুঁড়িটার কাছেই বারবার আসে। মনে হয়, শিমুলগাছটার সঙ্গে এই সবকিছুর একটা সম্পর্ক আছে।

মেঘুদা বলল, এটা বোধ হয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার আর একটা কথা মনে হচ্ছে। সত্যি মিথ্যে জানি না, বইতে পড়েছি। ১৯৭১ সালে এল জি লরেন্স নামে একজন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমিতে একটা পরীক্ষা করেছিল। সেখানকার একটা গাছে যন্ত্রপাতি লাগিয়ে সে এমন একটা শব্দ পেয়েছিল, যা অনেকে এখনও অবিশ্বাস্য মনে করে। নীলু, তুই জানিস বোধ হয়, মহাকাশে আরও কোনও গ্রহে কোনও বুদ্ধিমান প্রাণী আছে তার খোঁজ চলছে বিভিন্ন দেশে। বৈজ্ঞানিকরা নানারকম সংকেত পাঠাচ্ছেন, যদি কোনও উত্তর আসে। মহাকাশে শুধু আমাদের গ্যালাক্সিতেই দুশো বিলিয়ান নক্ষত্র আছে, সূর্যের মতন। এক একটা নক্ষত্রের যদি পাঁচটা করেও গ্রহ থাকে, সূর্যের গ্রহ অনেক বেশি, একটা গড় ধরা হচ্ছে, তা হলে এক হাজার বিলিয়ান গ্রহ হবে। এর মধ্যে শুধু পৃথিবী ছাড়া আর কোনও গ্রহে প্রাণী থাকবে না, তা কি হতে পারে ? অন্য গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলেছে এতকাল রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে। কিন্তু কিছু কিছু বৈজ্ঞানিকের ধারণা, পৃথিবীর কোনও কোনও গাছের সঙ্গে নিয়মিত মহাশূন্যের অন্য প্রাণীর যোগাযোগ হয়ে চলেছে। আমরা তা টের পাচ্ছি না। লরেন্স সাহেব ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমিতে গাছের গায়ে সেরকমই সাড়া পেয়েছিলেন। একে বলে বায়োলজিক্যাল কমিউনিকেশান্স। আরও কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক এতে বিশ্বাস করছেন এবং গবেষণা চালাচ্ছেন।

আমি বললুম, তুমি বলতে চাও, এই বড় শিমুল গাছটার সঙ্গেও মহাশূন্যের যোগাযোগ ছিল ?

মেঘুদা বলল, হলেও হতে পারে। জোর দিয়ে কিছু বলার অধিকার আমার নেই। মহাশূন্যের কোথাও থেকে বিদ্যুৎ তরঙ্গ আসছে কি না, কে জানে ! এই যে লোকটি বসে আছে, বোঝাই তো যাচ্ছে, ও ভোলানাথ

ছাড়া আর কেউ নয়। ভোলানাথই চিখরিয়ার বনদেবতা। বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, গাছতলায় শুয়ে থাকে। এই শিমুলগাছটার গায়ে ঠেস দিয়ে ও হয়তো কোনওদিন এই বিদ্যুৎতরঙ্গ টের পেয়েছিল। তারপর থেকে প্রায়ই এখানে আসত। ধানিয়ার কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে, সে কোথায় প্রথম ভোলানাথকে দেখেছিল। আমার দৃঢ় ধারণা, এখানেই। সেই শিমুলগাছটাকে কেটে ফেলায় ও যেমন রেগে গেছে, তেমন দুঃখও পেয়েছে।

আমি বললুম, তোমরা তখন বিশ্বাস করেনি। ও যে গান গাইছে, ওই গলার আওয়াজও আমার চেনা। পেছন দিক থেকে দেখেও ভোলানাথকে আমি চিনতে পারছি।

চুনিলালবাবু বললেন, আমি সকাল পর্যন্ত এখানে বসে থাকব। ওর মুখ না দেখে আমি বাড়ি যাব না।

মেঘুদা বলল, ও যে টানা সুরে গানটা গেয়ে চলেছে, তার কারণটা কী বুঝলি নীলু! ওই গান হচ্ছে ওর গাছের সঙ্গে কথা বলার ভাষা। অন্যদের ওপর রাগ ভুলে গিয়ে এখন শিমুলগাছটাকে আবার বাঁচাতে চাইছে।

পেছন ফিরে মেঘুদা চিখরিয়া আর রণছোড়জিকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কী চাও? শিমুলগাছটা আবার বেঁচে উঠুক?

দু'জনেই এক সঙ্গে বলল, জী হুজুর। অবশ্যই চাই।

চুনিলালবাবু অধীর আগ্রহের সঙ্গে বললেন, বাঁচবে, বাঁচবে? শাল গাছ কেটে ফেললে গোড়া থেকে আবার বেরোয়। শিমুলগাছেরও কি সে রকম হয়?

মেঘুদা বলল, কেন হবে না? আমরা ওর গুঁড়ির কাটা অংশটা চকচকে দেখেছিলাম মনে নেই? শুকিয়ে যায়নি। ভোলানাথ মাঝে মাঝে এসেই ওকে বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করে। আসুন, আমরাও ভোলানাথকে সাহায্য করি। আমরাও সবাই একসঙ্গে বলি, তুমি মরে যেও না, বেঁচে ওঠো, শিমুলগাছ, তুমি আবার বাঁচো, আমরা তোমাকে ভালবাসি। জোরে জোরে বলার দরকার নেই, মনে মনে বললেই হবে। খুব আন্তরিকভাবে বলতে হবে, অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে।

এর পর আমরা সবাই একেবারে নীরব। আমি মনে মনে দেখতে পেলাম সেই বিশাল শিমুলগাছটাকে। আকাশ থেকে একটা আলোর বিন্দু নেমে আসছে তার দিকে।

ভূষণ চৌধারির বয়েস ঊনপঞ্চাশ, তার মৃত্যুর সময় হয়নি, আরও আয়ু ছিল, সে বেঁচে উঠল। পরের দিনই তার জ্বর ছেড়ে গেল। গাছ কাটা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এরকমটা ঘটে গেল, এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু এরকম একটা কিছু ঘটলে যুক্তি এবং বিজ্ঞান পিছিয়ে যায়। পাতাপাহাড়ীর চতুর্দিকে রটে গেল, গাছ কাটার পাপেই সে মুমূর্ষু হয়েছিল। এটা খারাপ কিছু নয়। এর ফলে লোকে পটাপট গাছ কাটতে ভয় পাবে।

কিন্তু ঘটনাচক্র আরও অনেক দূর গড়াল।

পরদিন ভোরবেলাতেই দেখা গেল শিমুলগাছের কাটা গুঁড়িটার দু' পাশে দুটি নতুন পাতা বেরিয়েছে। ভোলানাথ কিন্তু তখনও উঠে গেল না, সে বসে রইল সেই একই জায়গায়, একইভাবে। যেন তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, শরীরের কোনও কষ্ট নেই, অন্য কোনও দিকে তাকায় না, শিমুলগাছটাই তার ধ্যানজ্ঞান। দিনের আলোয় কেউ তাকে বনদেবতা মনে করে না, কিন্তু রটে গেল যে এক মহাযোগী এসেছেন মৃত গাছের প্রাণ দিতে। দলে দলে লোক আসতে লাগল সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার জন্য। মেঘুদা কারুকে ভোলানাথের কাছে যেতে দেন না, গোল করে বাঁশ দিয়ে একটা বেড়া করে দিলেন, লোকেরা তার বাইরেই বসে প্রণাম জানায়, ফুল ছুঁড়ে দেয়, জয় রামজি, জয় সীয়া রাম, হর হর বোম বোম, এই সব নানারকম ধ্বনি দেয়, তাতেও ভোলানাথ যোগভ্রষ্ট হয় না।

তৃতীয় দিনে স্বয়ং ভূষণ চৌধারি ডাক্তারের কাঁধে ভর দিয়ে সেখানে এল, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল। রংমতীকেও সে জোর করে ধরে এনেছে, তাকেও বাধ্য করল প্রণাম জানাতে।

ধানিয়া ব্যাকুলভাবে ছুটে এসেছিল, মেঘুদা তাকে আলবেলি ঝাপটার কাছে যেতে দেয়নি, নিজের বাংলোতে এনে রেখেছে। ধানিয়ার পক্ষে ওই ভিড়ের মধ্যে যাওয়াটা ঠিক হত না, ওই পুণ্যলোভী জনতাই হয়তো তার চেহারা দেখে তাকে ডাইনি বলে মারতে যেত।

তৃতীয় দিনে ভোলানাথ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার পর তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। মেঘুদা তাকে আর জনসমক্ষে বার করেননি। খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ করে তাকে আর ধানিয়াকে তাদের নিজেদের জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ভোলানাথের জীবন কাহিনীর কিছুটা অংশ আমি গোপন রেখেছি।

মেঘুদা-চুনিলালবাবুকেও বলিনি। নিলয়দা আর আমি ভোলানাথকে কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে যাবার কিছুদিন পরে এক ভদ্রমহিলা তাঁর দশ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তার খোঁজে। আমরা আগে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম, সেই বিজ্ঞাপন অনেক দিন পরে ওঁর চোখে পড়েছে বা অন্য কেউ বলেছে। ভোলানাথের স্ত্রী আর ছেলে। ভোলানাথের আসল নাম অন্য, সে ঝরিয়ায় চাসনালা খনির অফিসে কাজ করত। সেই খনিতে বিরাট একটা দুর্ঘটনা হয়, তার পরবর্তী বীভৎস ব্যাপারগুলো দেখে তার মাথার গোলমাল শুরু হয়। নিজেই এক দিন স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে চলে যায়। মেয়েদের দেখলেই কেন সে হিংস্র হয়ে উঠত, সে কারণ অবশ্য জানা যায়নি।

নিলয়দার বিবেক দংশন হয়েছিল, আবার আমরা কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলে তাকে খুঁজতে এসেছিলুম, বহু ঘোরাঘুরি করেও তাকে আর পাইনি। যাতে আমরা আবার এসে তাকে ধরতে না পারি, সেইজন্যই সে ইচ্ছে করেই ওই জঙ্গল ছেড়ে চলে গিয়েছিল কি না কে জানে!

এখন কি এসব কথা আর কারুকে বলার কোনও মানে হয়? ধানিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে ঝরিয়ায় নিজের স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত? অরণ্যের মধ্যে গাছপালার সঙ্গে মিশে, ওদের ভালবেসে সে নিমগ্ন হয়ে আছে। শহরের নোংরামির মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে আবার যদি সে পাগল হয়ে যায়? সে দায়িত্ব কে নেবে? থাক, ও ধানিয়ার মরদ আর চিখরিয়ার বনদেবতা হয়েই থাক।

শিমুলগাছটির পুনরুত্থান প্রায় অলৌকিক বলেই মনে হবে। সাত দিনের মধ্যে সেখানে একটা তেজী চারা গজিয়ে যায়। এতদিনে আরও অনেক বড় হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। গ্রামের লোকেরা মাসখানেক এসে সেখানে পুজো দিত, তারপর তাদের উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়েছিল।

পাতাপাহাড়ীতে আমার আর যাওয়া হয়নি, চুনিলালবাবু মাঝে মাঝে পোস্টকার্ড লেখেন। কিছুদিন আগে তিনি একটা চমকপ্রদ খবর দিয়েছেন। ভূষণ চৌধারির দ্বিতীয় স্ত্রীর আর একটি সন্তান হয়েছে। এবার ছেলে। সে মহাধুমধামের ব্যাপার। সাতদিন ধরে লোককে খাওয়ানো দাওয়ানো, পুজো দেওয়া এসব তো আছেই, ভূষণবাবুর দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে গাছ-কাটার কারবার একেবারে বন্ধ করে দেবার জন্যই তার এই সৌভাগ্যের উদয়। সে ওই শিমুলগাছটাকে ঘিরে একটা মন্দিরও গড়ে দেবে।

তাতে অরণ্যের সৌন্দর্য অনেকখানি নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু তাকে বাধা দেবে কে? মেঘুদা দু' মাস পরেই ট্রান্সফার হয়ে গেছেন ডাল্টনগঞ্জ।

বর্তমান রেঞ্জার তিন ছেলেমেয়ের বাপ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, নিয়মিত কালীপুজো করেন, বিজ্ঞানটিজ্ঞানের ধার ধারেন না, তিনি মন্দিরের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবেন না।

মেঘুদা আজও বিয়ে করেনি। রংমতীও চিরকুমারী থাকার প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রেখেছে, এখনও পর্যন্ত।

আমি স্বপ্নে সেই বিশাল শিমুল গাছটিকে মাঝে মাঝে দেখতে পাই।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com